পরলোকে
সুগম যাত্রা
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
পরলোকে যাওয়ার যথার্থ পথ
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরলোকে সুগম যাত্রা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক রচিত

ইংরেজী **Easy Journey To Other Planets**-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, স্টকহোম, সিডনি, হংকং

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরলোকে সুগম যাত্রা

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কর্তৃক রচিত

ইংরেজী **Easy Journey To Other Planets**-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক ঃ শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, স্টকহোম, সিডনি, হংকং

Easy Journey To Other Planets (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০৫, ৩০০০ কপি
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০০৬, ৫০০০ কপি

মুদ্রণ ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীমৎ
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
মহারাজের আশীর্বাদসহ পৃথিবীর
বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হল।

—অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ডে)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ডে)
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ (৩ খণ্ডে)
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
গীতার রহস্য
জীবন আসে জীবন থেকে
শ্রীউপদেশামৃত
শ্রীঈশোপনিষদ
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
অমৃতের সন্ধানে
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
গীতার গান
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
ডি.বি-৪৫
সল্টলেক
কলকাতা—৭০০০৬৪

সূচীপত্র

১) অপ্রাকৃত জগৎ ১
২) বিভিন্ন গ্রহলোক ৪২

ভূমিকা

জীবসত্তা, বিশেষতঃ সভ্য মানব সমাজ সুখে শাশ্বত জীবন যাপন করার অভিলাষ করে। এটাই তার পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কেননা সূচনা থেকেই জীবসত্তা শাশ্বত ও আনন্দময়। তবে বর্তমান মায়াবদ্ধ অবস্থায় মানব সমাজ জন্ম-মৃত্যুময় সংসার চক্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে। এইজন্য সে সুখ লাভ করেনি, অমরত্ব লাভ করেনি। সম্প্রতি মানুষের অন্যান্য গ্রহলোকে যাত্রার ইচ্ছা হয়েছে। মানুষের এইরকম ইচ্ছাও খুব স্বাভাবিক। কেননা, স্বরূপতঃ জড়াকাশ বা চিদাকাশ-এর যে কোন অংশে তাঁর যাওয়ার অধিকার রয়েছে। এইরকম গ্রহযাত্রা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই তা উৎসাহব্যঞ্জক কেননা এই আকাশ নানাবিধ, বৈচিত্র্যপূর্ণ অসংখ্য গ্রহলোকে পরিপূর্ণ। আর এই গ্রহগুলিতে সকল প্রকার জীবকুলের বসবাস। ভক্তিযোগ পন্থায় ঐ গ্রহলোক যাত্রার অভিলাষ পূর্ণ করা যায়। এই ভক্তিযোগ পন্থায় ইচ্ছানুযায়ী যে কোন লোকে স্থানান্তরিত হওয়া যায়—সম্ভবতঃ এমন গ্রহলোকে যেখানে জীবন কেবল শাশ্বত, সনাতনই নয়, আনন্দময়ও। অথচ সেখানে নানাবিধ বৈচিত্র্যময় উপভোগ্য প্রকৃতিও আছে। অপ্রাকৃত, দিব্য চিন্ময় লোকের স্বাধীনতা যে কেউ লাভ করলে তাকে জন্ম-মৃত্যু জরা ব্যাধিতে পূর্ণ এই দুঃখালয়ে আর ফিরে আসার প্রয়োজন হবে না।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খুব সহজেই এই সিদ্ধিস্তর লাভ করা যায়। ভক্তিযোগের নির্দিষ্ট পন্থা স্বগৃহে কেবল অনুসরণ করতে হবে। উপযুক্ত পরিচালনায় এই পন্থা অনুসরণ যেমন সরল তেমনই উপভোগ্য। সর্বোচ্চ এই ভক্তিযোগ পন্থায় কিভাবে অন্যান্য গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হওয়া যায়—সেই সম্পর্কে জনসাধারণ এবং বিশেষতঃ দার্শনিক ও ধর্মীয় নেতাদের তথ্য প্রদান করতে এখানে এক প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

অপ্রাকৃত জগৎ

জড় বিজ্ঞান অবশেষে একদিন সনাতন অপ্রাকৃত জগৎ (anti material world) আবিষ্কার করবে। এই জগৎ জড়বাদীদের কাছে দীর্ঘ কাল অজ্ঞাত ছিল। এই জগৎ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়ায় (২৭ অক্টোবর ১৯৫৯) নীচের খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

ষ্টক্‌হোলম্ (২৬ অক্টোবর ১৯৫৯) ঃ অ্যান্টি প্রোটন্ আবিষ্কারের জন্য আজ দুই মার্কিন বিজ্ঞানীকে পদার্থবিদ্যায় নোবল্ প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। এই অ্যান্টি প্রোটন্ (anti proton) প্রমাণ করছে যে বস্তুকণা জড় ও চেতন এই দুই আকারে বর্তমান। তারা হলেন ইটালী দেশীয় ৬৯ বছর বয়স্ক ডঃ এমিলো সেগ্রে (Dr. Emillo Segre) আর সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন। নতুন মতবাদের মূল ধারণা অনুযায়ী অন্য এক প্রকৃতি, পরা প্রকৃতি রয়েছে যা অপ্রাকৃত তত্ত্ব দিয়ে তৈরি। অপ্রাকৃত জগৎ অণু ও পরমাণু বস্তুকণা দিয়ে তৈরি। আমাদের পরিচিত জগতের গতির পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে কক্ষপথে এগুলি ভ্রমণ করছে। এই দুই প্রকৃতির বা জগতের সংঘর্ষ হলে উভয়ই এক মুহূর্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এই বিবরণে নীচের প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করা হয়েছে।

১) জড় অণু বা কণার বিরুদ্ধধর্মী এক অপ্রাকৃত বা চিৎ কণ বা অণু আছে।

২) এই জড়া প্রকৃতি বা জগৎ ছাড়া আর এক প্রকৃতি বা জগৎ আছে; যার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

৩) এই জড়া প্রকৃতি (বা জগৎ) ও অপ্রাকৃত বা চিদ্ জগতের কোন এক সময় সংঘর্ষ হলে একটি অপরটিকে ধ্বংস করবে।

এই তিনটি প্রস্তাবনার প্রথম ও দ্বিতীয়টিকে ঈশ্বরবাদীরা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন, তবে অপ্রাকৃত বস্তুর সীমিত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার মধ্যেই তৃতীয় প্রস্তাবটি আমরা স্বীকার করি। বস্তুতঃ অসুবিধা হচ্ছে এই যে

বিজ্ঞানীদের অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে ধারণা কেবল প্রাকৃত বস্তুর অন্য রকম বৈচিত্র্যতা পর্যন্ত সীমিত, অথচ যথার্থ অপ্রাকৃত বস্তু অবশ্যই পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত বা চিৎ প্রকৃতি। স্বরূপতঃ জড় বস্তু বিনাশশীল। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তুকে সকল জড় বস্তুর লক্ষণমুক্ত হতে হলে অবশ্যই তা অবিনাশী হতে হবে, সনাতন হতে হবে। জড় বস্তু বিনাশী ও বিভাজ্য যদি হয় তবে অপ্রাকৃত বস্তু বা চিৎকণ অবশ্যই অবিনাশী ও অবিভাজ্য হবে। প্রামাণিক শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এই প্রস্তাবগুলি আলোচনার প্রয়াস করব।

বিশ্বের সর্ববাদিসম্মত শাস্ত্র হচ্ছে বেদ। এই বেদ চার ভাগে বিভক্ত—ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। সাধারণ লোকের পক্ষে বেদের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করা কঠিন। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে মহাভারত নামে ঐতিহাসিক মহাকাব্য ও আঠারটি পুরাণে চারটি বেদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রামায়ণও ঐতিহাসিক কাব্য যাতে বেদ থেকে সকল প্রয়োজনীয় তথ্যই রয়েছে। এই জন্য চার বেদ, বাল্মীকি রচিত মূল রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি হল বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থেরই শ্রেণীবিভাগ। উপনিষদগুলি হচ্ছে চারটি বেদের অংশ আর বেদান্তসূত্র হচ্ছে বেদের সারমর্ম। সকল উপনিষদের সারমর্ম ও বেদান্তসূত্রের প্রাথমিক বিশ্লেষণরূপে (সকল বৈদিক শাস্ত্রের বিষয়বস্তু রূপে) ভগবদ্গীতাকে গ্রহণ করা হয়েছে। লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবক্তা হওয়ায় একমাত্র ভগবদ্গীতাকেই সমস্ত বেদের সারমর্ম রূপে সিদ্ধান্ত করা যায়। পরা প্রকৃতি বা অপ্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে তিনি অপ্রাকৃত চিদ্-জগত থেকে জড় জগতে অবতরণ করেন।

পরমেশ্বর ভগবানের উৎকৃষ্টা বা পরাশক্তিকে ভগবদ্গীতায় পরা প্রকৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে বিনাশী জড় বস্তুর দুইটি রূপ আছে অথচ ভগবদ্গীতায় সবচেয়ে প্রকৃষ্টভাবে দুই রকম শক্তি বা প্রকৃতি রূপে জড় অচিৎ ও চিৎ শক্তি

চিন্ময় বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। জড় বস্তু দ্বারা জড় জগৎ বা জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে আর ঐ একই শক্তি উৎকৃষ্টরূপে, পরা প্রকৃতি রূপে অপ্রাকৃত বা চিদ্ জগৎ সৃষ্টি করেছে। জীবকুল এই পরা শক্তি বা প্রকৃতির অন্তর্গত। নিকৃষ্ট, জড়া প্রকৃতিকে অপরা প্রকৃতি বলা হয়। ভগবদ্গীতায় এইভাবে সৃজনীশক্তিকে অপরা ও পরা প্রকৃতি—এই দুই নামে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জড় বস্তুর কোন সৃজনীশক্তি নেই। জীবশক্তির সুষ্ঠু পরিচালনায় জড় বস্তুর উৎপত্তি হয়। তাই স্থূল অবস্থায় জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বরের অব্যক্ত শক্তি। যখনই আমরা শক্তির কথা ভাবি তখন আমরা স্বভাবতঃই শক্তির উৎস, শক্তিমানের কথা মনে চিন্তা করি। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির কথায়, যুগপৎ আমরা ঐ শক্তি উৎপাদনের স্থল (Power House)-র কথা মনে করি। শক্তি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। শক্তি সব সময়ই উন্নত জীবসত্তার পরিচালনাধীন। যেমন—আগুন, আলো ও তাপ নামে দু'রকম শক্তির উৎস। আগুনকে বাদ দিলে আলো ও তাপ-এর স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তেমনই অপরা ও পরা শক্তিগুলি এক উৎস থেকে নেওয়া। যে নামেই তাকে অভিহিত করা হোক না কেন। ঐ শক্তির উৎস অবশ্যই সবকিছু সম্পর্কে অবগত এক চেতনসত্তা। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সেই পরম চেতনসত্তা বা সর্বাকর্ষক পরমপুরুষ।

বেদে পরমচেতনা বা পরম সত্যকে সকল শক্তির পরম উৎস, ভগবান বলা হয়েছে। সীমাবদ্ধ দুরকম শক্তির আবিষ্কার বর্তমান বিজ্ঞানের প্রগতির সূচনা মাত্র। এখন জড় ও চেতন এই দুই বস্তুকণার উৎসের অনুসন্ধানে বর্তমান বিজ্ঞানীদের আরো অগ্রসর হতে হবে।

অপ্রাকৃত বস্তুকণা, চিৎকণাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? অণু বা অচিৎ কণা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে কিন্তু অপ্রাকৃত অণু বা চিৎকণা সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তবে ভগবদ্গীতায় অপ্রাকৃত বা চিৎকণের উজ্জ্বল বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

এই অপ্রাকৃত কণা জড় দেহে রয়েছে। এই চিৎকণের অবস্থিতির জন্য জড় দেহটি শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন থেকে ক্রমোন্নতির পথে বার্ধক্যে পরিবর্তিত হয়। এরপর ঐ চিৎকণাটি পুরানো, অকর্মণ্য দেহটি পরিত্যাগ করে অন্য এক জড় শরীর গ্রহণ করে।

জীবদেহের এই তথ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে প্রতিপন্ন করে যে শক্তি দুই রূপে বিরাজমান। তাদের একটি চিৎ কণটি জড় দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সব ব্যাপারেই অপরটি অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। এই জন্য অপ্রাকৃত বা চিৎ কণটি নিঃসন্দেহে জড়াশক্তির চাইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জড়া শক্তির হানিতে শোক করা উচিত নয়। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি এই ধরনের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি ঠিক ঋতু পরিবর্তনের গমনাগমনের মতো জড়াশক্তির ক্রিয়াকর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম জড়ীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে প্রতিপন্ন হয় যে জীবশক্তি বা জীবপ্রকৃতির চেয়ে নিকৃষ্ট এক জড়াশক্তি দিয়ে জড় শরীর সৃষ্ট। সুখ-দুঃখকে নিকৃষ্ট প্রকৃতির ক্রিয়াপ্রক্রিয়া জাত বলে তা যে বিভিন্ন জড় স্তর, তা অবগত হয়ে যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিক্ষুব্ধ হন না—তিনিই অনন্ত, চিন্ময় ও আনন্দ পূর্ণ জীবন—অপ্রাকৃত, চিজ্জগৎ পুনরায় লাভ করতে সক্ষম হন।

এখানে অপ্রাকৃত জগতের উল্লেখ করা হয়েছে। এবং আরো বলা হয়েছে যে ঐ জগতে 'ঋতুর' অস্থিরতা নেই; সেখানে সবকিছুই শাশ্বত, আনন্দময় ও জ্ঞানময়। কিন্তু যখন আমরা এরকম একটি জগতের কথা বলি তখন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সেই জগতের রূপ ও বিভিন্ন শ্রেণীর যে দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে তা আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে।

জড় শরীর বিনাশী এবং এইজন্যই তা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য। জড় জগৎও সেইরকম। তবে চেতন জীবশক্তি অবিনাশী আর তাই এটি নিত্য। দক্ষ বিজ্ঞানী এইভাবে জড় ও চেতন বস্তুকণার যথাক্রমে

অনিত্য ও নিত্য রূপে তাদের বিভিন্ন লক্ষণ, বৈশিষ্ট্যগুলির পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন।

জড় বস্তুর দুই রূপের আবিষ্কারকদের এখনও অপ্রাকৃত বস্তু চিৎ কণের গুণসমূহ আবিষ্কার করতে হবে। ইতিমধ্যে ভগবদ্গীতায় নীচের লেখায় এর উজ্জ্বল বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই মূল্যবান তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা আরও গবেষণা করতে পারেন।

চিৎকণটি সূক্ষ্মতম অচিৎকণের চেয়েও সূক্ষ্ম। এই জীবশক্তি এতই প্রবল যে এটির প্রভাব সমগ্র জড় শরীরে পরিব্যাপ্ত। অচিৎ শক্তির তুলনায় চিৎশক্তির অফুরন্ত শক্তি রয়েছে আর তাই এটিকে বিনষ্ট করা যায় না।

এই হল ভগবদ্গীতায় চিৎকণের বর্ণনার সূচনা মাত্র। নীচে এ সম্পর্কে গীতায় আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিৎকণ সূক্ষ্মতম রূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে আবদ্ধ আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় দেহ বিনাশী হলেও সূক্ষ্মতর চিৎকণ, অপ্রাকৃত কণা নিত্য, সনাতন। তাই এই নিত্য তত্ত্বে আগ্রহশীল হওয়া উচিত।

যখন জড় বিজ্ঞানীরা চিৎকণের গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলি অবগত হয়ে তাকে অনিত্য অচিৎকণের সান্নিধ্য থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে, তখনই বিজ্ঞানের পূর্ণতা, সার্থকতা লাভ হবে। এই রকম মুক্তি বৈজ্ঞানিক প্রগতির পরাকাষ্ঠা সূচনা করবে।

বিজ্ঞানীরা যে আভাষে জানাচ্ছেন অপ্রাকৃত বা চিৎকণায় তৈরি আর একটি প্রকৃতি বা জগৎ রয়েছে, আর জড়া প্রকৃতি বা জড় জগতের সঙ্গে ঐ জগতের সংঘাত হলে উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে—এই কথা আংশিক সত্য। সংঘাত আছে নিরন্তর—প্রতি মুহূর্তে জড় বস্তুকণা বিনষ্ট হচ্ছে, আর অপ্রাকৃত বস্তুকণা মুক্ত হওয়ার প্রয়াস করছে। এই বিষয়টি ভগবদ্গীতায় নীচে এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—চিৎকণ জীবাত্মা, অপ্রাকৃত বস্তুকণা প্রাকৃত বস্তুকণাকে সক্রিয় করতে প্রভাবিত

করে; জীবাত্মা সর্বদাই অবিনাশী। যতক্ষণ অপ্রাকৃত বস্তুকণা স্থূল এবং সূক্ষ্ম জড় পিণ্ডে রয়েছে, ততক্ষণ তা এক চিৎকণায় প্রকাশিত। এই দুই বস্তুকণার নিরন্তর সংঘাতে অপ্রাকৃত বস্তুকণার কখনও নাশ হয় না। অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে কখনও কেউ অপ্রাকৃত বস্তুকণা ধ্বংস করতে পারে না।

এই জন্য বিজ্ঞানীদের অপ্রাকৃত বস্তুকণার শুধু সীমিত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সংঘর্ষে উভয় জগতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার অনুমান সঠিক বলে আমরা মনে করি। ভগবদ্গীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অপ্রাকৃত বস্তুকণার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হল তা কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

সূক্ষ্ম ও অপরিমেয় অপ্রাকৃত বস্তুকণা সব সময়ই অবিনাশী, শাশ্বত এবং সনাতন। তবে কিছুকাল পরে এর জড় বস্তুর আচ্ছাদন বিনষ্ট হয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি কাজ করে। অপ্রাকৃত জগতের ধ্বংসের ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই, কেননা প্রাকৃত জগৎ ধ্বংস হলেও ঐ অপ্রাকৃত জগৎ বর্তমান থাকে।

কোন এক অবস্থায় সৃষ্টির সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জড় দেহ ও জড় জগত সৃষ্টি হয়েছে আর তাই এদের ধ্বংসও হবে। অপ্রাকৃত চিৎজগৎ নিত্য বিরাজমান। এই জগতের সৃষ্টি ও বিনাশের নির্দিষ্ট সময় নেই; এর বার বার সৃষ্টিও নেই, বিনাশও নেই। এই জগৎ নিত্য শাশ্বত আর এইজন্য তা চির পুরাতন তবু এই জগৎ নিত্য, নতুন ও প্রাণবন্ত, জড় বস্তুকণার বিনাশ হলেও, অপ্রাকৃত বস্তুকণা অপরিবর্তিত থাকে।

এই অপ্রাকৃত, চিজ্জগত ও অপ্রাকৃত বস্তুকণা, চিৎকণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জড় জগতের বিনাশ হলেও অপ্রাকৃত, চিজ্জগত সকল পরিস্থিতিতে বিরাজমান থাকে। পরে এই সম্বন্ধে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা হবে।

ভগবদ্গীতা থেকে নীচের শিক্ষা, বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করতে পারেন—অপ্রাকৃত বস্তু কণা যে অবিনাশী যারা জানেন সেই জ্ঞানীরা অবগত যে তার কখনও কোন উপায়েই বিনাশ হয় না।

আণবিক বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমার দ্বারা জড় জগতকে ধ্বংসের কথা বিবেচনা করতে পারেন; কিন্তু তাদের কোন অস্ত্রই অপ্রাকৃত, চিন্ময় জগতকে ধ্বংস করতে পারে না। অপ্রাকৃত বস্তুকণা আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নীচের লাইনে—

অস্ত্র দ্বারা একে খণ্ড খণ্ড করা যায় না, আগুনেও পোড়ানো যায় না; জলে ভেজানো যায় না, বায়ুতে শুকানো যায় না; এটা অবিভাজ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। এটি নিত্য, সর্বগত; স্বরূপতঃ অপরিবর্তনীয় হওয়ায় এর বৈশিষ্ট্য সর্বদাই নিশ্চল। সকল জড় গুণ বিলক্ষণ হওয়ায়, এটি অব্যক্ত; অচিন্ত্য ও অবিকারী। এই অপ্রাকৃত চিৎতত্ত্ব নিত্য হওয়ায় এ বিষয়ে কারো কখনও শোক করা উচিত নয়।

ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য সকল বৈদিক শাস্ত্রে এইভাবে উৎকৃষ্ট প্রকৃতি (অপ্রাকৃত শক্তি) চিৎশক্তিকে প্রাণ, জীব শক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। জড় উপাদানের সংমিশ্রণে এই জীবাত্মাকে সৃষ্টি করা যায় না। ৮টি জড় উপাদানকে নিকৃষ্ট শক্তি বলা হয়েছে; এগুলি হচ্ছে ১) মাটি, ২) জল, ৩) আগুন, ৪) বায়ু, ৫) আকাশ, ৬) মন, ৭) বুদ্ধি ও ৮) অহংকার। এছাড়া জীবশক্তি বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব আছে একে পরা প্রকৃতি বা চিৎশক্তি বলা হয়েছে। কেন না, পরম চৈতন্য স্বরূপ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিয়ামক, তাদের অধ্যক্ষ।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত আটটি ভৌতিক উপাদানের সীমার মধ্যে জড়বাদীরা সীমাবদ্ধ। এখন জড়বাদীরা যে অপ্রাকৃত তত্ত্ব বা চিদ্জগতের সামান্য প্রাথমিক তথ্য লাভ করেছে, এটি খুব উৎসাহজনক। আমরা আশা করি যে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড়াতীত অপ্রাকৃত জগতের মূল্যায়ন জড়বাদীরা করতে সক্ষম হবেন। তবে অপ্রাকৃত শব্দটি সকল জড় গুণাবলীর বিরোধী তত্ত্ব।

অবশ্য অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে যারা অভিমত প্রকাশ করেন, এই রকম মনোধর্মীরাও রয়েছেন। তাঁরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত আর তারা দু'রকম বিভিন্ন ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করে বসেন। জড়বাদীরা হয় অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপাদানকে অস্বীকার করেন অথবা এক বিশেষ পরিস্থিতিতে জড় উপাদানের খণ্ড খণ্ড হয়ে বিনষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করেন। অন্য দল ২৪টি তত্ত্ব সহ জড় উপাদান প্রত্যক্ষভাবে বিরোধীরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বকে গ্রহণ করেন। এই দলকে সাংখ্যকার বলে। তারা জড় উপাদানের তথ্যানুসন্ধান করে, তাদের সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। তথ্য অনুসন্ধানের পর সাংখ্যকাররা অন্তিমে শুধু এক জড়াতীত নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব গ্রহণ করে। তবে এই সব শুষ্ক তার্কিকদের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলি হল যে তারা নিকৃষ্ট শক্তি দ্বারা শুষ্কতর্ক করে। তারা উচ্চতর অধিকারী, আচার্যদের প্রদত্ত তথ্য সংগ্রহ করে না। অপ্রাকৃত তত্ত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গমের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট শক্তি, ভক্তিযোগের চরম স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রয়োজন। ভক্তিযোগই সেই উৎকৃষ্ট বা পরা প্রকৃতির বিশেষ ক্রিয়াকলাপ, জাগতিক স্তর থেকে কেউ অপ্রাকৃত চিজ্জগতের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ করতে পারে না। কিন্তু জড় ও চেতন উভয় শক্তিরই নিয়ন্তা, পরমেশ্বর ভগবান তার অহৈতুক কৃপায় জগতে অবতরণ করে অপ্রাকৃত চিজ্জগতের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান করেন। এইভাবে আমরা চিজ্জগত সম্বন্ধে জানতে পারি। গুণগতভাবে পরমেশ্বর ও জীব উভয়েই অপ্রাকৃত তত্ত্ব। এইভাবে জীব সম্বন্ধে সুবিস্তৃত শিক্ষানুশীলনের মাধ্যমে আমরা পরমেশ্বর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। জীবমাত্রই এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। তাই পরম চেতনসত্তা নিশ্চয় পরমপুরুষ হবেন। বৈদিক সাহিত্যে পরমপুরুষকে 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। 'কৃষ্ণ' নামটিই হল পরমেশ্বর ভগবানকে প্রকৃতভাবে বুঝবার জন্য যথার্থ নাম। তিনি জড় ও চেতন উভয় জগতের নিয়ন্তা। 'কৃষ্ণ' কথাটির তাৎপর্য হচ্ছে তিনি পরম নিয়ন্তা। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

দুটি প্রকৃতি আছে—জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি, বা প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত জগৎ। আটটি জড় উপাদানের নিকৃষ্ট প্রকৃতি দ্বারা জড় জগতের সৃষ্টি। অপ্রাকৃত জগৎ উৎকৃষ্ট পরা প্রকৃতি জাত।

জড়া প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি উভয়ের উৎস পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবান, তাই আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমগ্র সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তিম কারণ।

কৃষ্ণের (অপরা ও পরা) দুইটি প্রকৃতি জড় জগৎ ও অপ্রাকৃত জগৎকে প্রকট করে বলে তাঁকে পরম সত্য বলা হয়। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান কৃষ্ণ এইভাবে তা বিশ্লেষণ করেছেন—

প্রিয় অর্জুন, আমিই পর-তত্ত্ব, আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। মণিসমূহ যেমন মালার সূত্রের আশ্রিত, সবকিছুই তেমনভাবে আমার প্রকৃতিতে আশ্রিত।

অপ্রাকৃত জগৎ আবিষ্কারের অনেক আগে, এই বিষয় ভগবদ্‌গীতার পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল। গীতা থেকে জানা যায় যে এই তত্ত্বজ্ঞান পূর্বে সূর্যদেবকে প্রদান করা হয়েছিল। এর অর্থ হচ্ছে অন্ততঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১২ কোটি বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। গীতায় প্রাপ্ত জ্ঞানের সামান্য অংশমাত্র আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

অপ্রাকৃত জগতের কথা ভগবদ্‌গীতায়ও দেখা যায়। সেইসব প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সেই চিৎ-জগৎটি চিদাকাশে বিরাজমান ভগবদ্‌গীতায় যাকে সনাতন ধাম বা নিত্য জগৎরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

জড় উপাদান দ্বারা যেমন জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক সেই রকম চিন্ময় উপাদান দ্বারা অপ্রাকৃত জগৎ ও তার বস্তুসকল সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে চিন্ময় জীবের বাস। অপ্রাকৃত, চিদ্‌জগতে কোন জড় বস্তু নেই। সেখানে সব কিছুই চিন্ময়। সেখানে পরম পুরুষ হচ্ছেন ভগবান স্বয়ং। চিজ্জগতের দিব্য জীবেরা নিত্য, চিন্ময় ও

আনন্দময়। পক্ষান্তরে বলা যায়, তাঁরা সকলেই সমস্ত ভগবদ্ গুণাবলীতে বিভূষিত।

জড় জগতের সর্বোচ্চ লোককে ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক বলে। সর্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন হওয়ায় তারা এই ব্রহ্মলোকবাসী। জড় জগতের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা হচ্ছেন ব্রহ্মলোকের অধিপতি। আমাদের মতো তিনিও একজন জীব, তবে জড় জগতে তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু তিনি ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত নন, তিনিও ভগবানের কর্তৃত্বাধীন জীবসমূহের সমশ্রেণীভুক্ত। ভগবান ও জীবকুল উভয়েই অপ্রাকৃত জগতের অন্তর্গত। তাই বিজ্ঞানীরা অপ্রাকৃত জগতের গবেষণা করে বিশ্বের জনগণের সেবা করতে পারে—কিভাবে এই জগৎ পরিচালিত হয়, কিভাবে তারা আকার প্রাপ্ত হয়, কারা এখানে অধিপতি ইত্যাদি বিষয়ে তারা গবেষণা করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। ভগবদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাথমিক শিক্ষানুশীলন। বিজ্ঞান জগতের সকল ব্যক্তিরই এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অনুশীলন করা উচিত। এই দুইটি গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রগতির বহু সূত্র দেওয়া আছে, এ থেকে বহু নতুন আবিষ্কারের সন্ধান পাওয়া যাবে।

পরমার্থবাদী ও জড়বাদীরা দুই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক। পরমার্থবাদীরা বেদের মতো প্রামাণিক শাস্ত্র থেকে জ্ঞান লাভ করেন। বৈদিক শাস্ত্র দিব্য গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় প্রামাণিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত। এই গুরু শিষ্য পরম্পরা সম্পর্কেও ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন যে তিনি এই গীতাতত্ত্ব শত সহস্র বছর আগে সূর্যদেবকে শিক্ষা দিয়েছেন। সূর্যদেব তার পুত্র বর্তমান মানব জাতির জনক মনুকে তা শিক্ষা দেন। মনু পরবর্তীকালে এই দিব্যজ্ঞান তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যে বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ইক্ষ্বাকু ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাবের সময় (৫০০০ বছর পূর্বে) এই সুদীর্ঘ গুরুশিষ্য পরম্পরা প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাই ভগবান কৃষ্ণ এই যুগে প্রথম শিষ্যরূপে অর্জুনকে পুনরায় গীতার জ্ঞান প্রদান করেন। এইজন্য এই যুগের পরমার্থবাদীরা অর্জুন থেকে প্রবাহিত পরম্পরার অন্তর্গত। জাগতিক গবেষণাকার্যের অনর্থমুক্ত হয়ে পরমার্থবাদীরা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান (এই গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায়) লাভ করে, নিজেকে উদ্বেগমুক্ত করতে পারেন।

যাই হোক, ঘোর জড়বাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় ধামে বিশ্বাস করে না। কখন কখন তারা অতীব গুণসম্পন্ন, উচ্চশিক্ষিত, প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তারা দুর্ভাগা, নরাধম জড় মায়ায় বিমোহিত হয়ে, অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান বিহীন। তাই, জড় বিজ্ঞানীরা ক্রমশ অপ্রাকৃত লোকালয়ের দিকে যে অগ্রসর হচ্ছে তা একটি শুভ লক্ষণ। এমনকি যেখানে পরমেশ্বর ভগবান সেই লোকের অধিপতিরূপে বাস করেন জীবকুলও সেখানে বাস করে তাঁর সেবা করে সেই অপ্রাকৃৎ, চিজ্জগতের বিশদ বিবরণ জানাতে তারা হয়তো যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারেন। জীবেরা হচ্ছে ভগবানের সেবক ও তাঁর থেকে গুণগতভাবে অভিন্ন। কিন্তু একই সঙ্গে তারা ভগবদধীন। অপ্রাকৃত, চিজ্জগতে অধিপতি ও অধস্তনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই—পূর্ণতা ও জড়তাশূন্যই হল সম্বন্ধ।

জড় জগৎ বিনাশশীল। পদার্থ বিজ্ঞানীদের ধারণা, জড় ও চেতন জগতের ঘটনাক্রমে সংঘাত হলে, প্রলয় হয়—ভগবদ্গীতার শিক্ষা অনুযায়ী তা আংশিক সত্য। জড় জগৎ হল পরিবর্তনশীল জড় গুণের এক সৃষ্টি। এই গুণগুলি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামে অভিহিত। রজোগুণের দ্বারা এই জড়জগতের সৃষ্টি, সত্ত্বগুণের দ্বারা পালন ও তমোগুণের দ্বারা ধ্বংসকার্য সাধিত হয়। জড় জগতে এই গুণত্রয় সর্বত্র বিরাজমান। তাই বিশ্বের সর্বত্র প্রতি ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেণ্ডে

সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের কাজ চলেছে। এখানকার সর্বোচ্চ ব্রহ্মালোকও এই গুণগুলির প্রভাবাধীন, যদিও সত্ত্ব গুণাধীন এই লোকের অধিবাসীদের আয়ুষ্কাল ৪,৩০০,০০০×১,০০০×২×৩০×১২×১০০ সৌর বছর। যাই হোক, এত দীর্ঘ জীবন হলেও ব্রহ্মালোকেও প্রলয় হয়। ভূলোকের তুলনায় ব্রহ্মালোকে জীবন কল্পনাতীত দীর্ঘ হলেও অপ্রাকৃত চিজ্জগতের অনন্ত জীবনের তুলনায় তা এক নিমিষমাত্র। তাই ভগবদ্‌গীতার প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ধাম, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতের গুরুত্ব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ৪,৩০০,০০০×১,০০০×২×৩০×১২×১০০ সৌর বছরে বিশ্বের সব লোকেই প্রলয় হয়। জড় জগতে প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই লোকের সমগ্র জীবকুলও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তবে জীবমাত্রই স্বরূপত চিৎকণ, অপ্রাকৃত বস্তু। কিন্তু অপ্রাকৃত কার্যকলাপ অনুশীলন করার মাধ্যমে জীব নিজেকে অপ্রাকৃত, চিজ্জগতে উন্নীত না করলে, জড় জগতের প্রলয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌতিক অস্তিত্ব বিনষ্ট হয় এবং জীব এক নতুন বিশ্বে এক জড় আকৃতিতে পুনর্জন্মের অধীন হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীব তখন জন্মমৃত্যুময় সংসার তাপ ভোগ করে। একমাত্র যারা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত তারাই কেবল এই জগতে জড় দেহ ত্যাগের পর নিঃসন্দেহে অপ্রাকৃত জগতে স্থানান্তরিত হয়। অপ্রাকৃত কর্মের অনুশীলনের মাধ্যমে তারা ভগবদ্‌ধামে ফিরে গিয়ে অমৃতত্ব লাভ করে।

এই অপ্রাকৃত বা চিদ্‌কর্ম কি? এগুলি হল ভবৌষধি। যেমন, কেউ অসুস্থ বোধ করলে, চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়; চিকিৎসক তাকে ঔষধের নির্দেশ দেয়, যাতে দুর্দশাগ্রস্থ রোগী সেই অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করে। তেমনই জীব হল ভবরোগী আর সেইজন্য তার পারমার্থিক সদ্‌ বৈদ্যের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন। তার রোগ কি? সে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধিময় সংসার দুঃখ ভোগ করছে। 'ভগবদ্‌

দর্শন' রূপ আরোগ্য পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে সে জন্ম-মৃত্যুবিহীন নিত্য জীবন অপ্রাকৃত জগতে ফিরে যেতে পারে।

জড় জগতের প্রলয় হয় দুই ভাবে। ৪,৩০০ ০০০×১০০০ সৌর বৎসরান্তে বা ব্রহ্মার এক দিনের অবসানে, সর্বোচ্চ ব্রহ্মালোকের আংশিক প্রলয় হয়। সেই আংশিক প্রলয়ের সময় সর্বোচ্চ ব্রহ্মালোকে প্রলয় হয় না, কিন্তু ৪,৩০০,০০০×১,০০০×২×৩০×১২×১০০ সৌর বছরের পর সমগ্র জড় প্রকাশ অপ্রাকৃত দিব্য দেহে বিলুপ্ত হয় যেখান থেকে জড় প্রকাশের উদ্ভব হয়েছিল। প্রকট ও প্রলয়ের পর বিলুপ্তি ঘটে। জড় আকাশ থেকে বহু বহু দূরে অপ্রাকৃত জগতের কখনও প্রলয় হয় না। অপ্রাকৃত জগতে জড় জগৎ বিলুপ্ত হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের হয়তো এক সংঘাত হতে পারে ও জড় জগতের বিনাশ হতে পারে। কিন্তু অপ্রাকৃত জগত কখনই বিনষ্ট হবে না। শাশ্বত, নিত্য অপ্রাকৃত জগৎ জড় বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশিত নয়, অদৃশ্য। জড় গুণের ঠিক বিপরীত হওয়ায় জড় বিজ্ঞানীরা কেবল এই জগতের তথ্য পেতে পারে। কেবল মুক্তাত্মা আচার্যদের কাছ থেকেই অপ্রাকৃত জগতের পূর্ণ তথ্য জানা যায়, যাঁরা অপ্রাকৃত তত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছেন। ভগবানের শরণাগত বিনম্র ভক্ত শ্রৌত পন্থায় এই জ্ঞান লাভ করেন।

এইভাবে সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মার হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করা হয়। ব্রহ্মাজীই এই জ্ঞান নারদমুনিকে প্রদান করেন। সেইরকম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেব বিবস্বানকে ভগবদ্‌গীতা তত্ত্ব শিক্ষা দান করেন। আর এই শ্রৌত পন্থায় শিষ্য পরম্পরাক্রম ভগ্ন হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে এই শিক্ষা পুনরায় দান করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য অর্জুন কৃষ্ণের শিষ্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিশ্বের ঘোর বিষয়ী জড়বাদীদের সকল সংশয় দূরীভূত করবার উদ্দেশ্যে অর্জুন সকল প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তর দেন যাতে একজন অবিবেকীও তা বুঝতে পারে। জড় জগতের চাকচিক্যে বিমোহিত ব্যক্তিরাই একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করে না। অপ্রাকৃত, চিজ্জগৎ বিশদভাবে উপলব্ধির পূর্বে সম্পূর্ণভাবে সদাচারী ও অমল হৃদয় হওয়া চাই। ভক্তিযোগ হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত দিব্যকর্ম যা নবীন ও সিদ্ধ যোগী উভয়ই অনুশীলন করতে পারেন।

জড় জগৎ হচ্ছে চিজ্জগতের এক প্রতিবিম্বস্বরূপ। নির্মল হৃদয়, সদাচারী, বিবেকী ব্যক্তি অপ্রাকৃত জগতের বিস্তৃত তথ্য, সংক্ষেপে ভগবদ্‌গীতার শিক্ষা থেকে গ্রহণ করতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে সেখানে জড় জাগতিক বিষয় থেকেও চিৎতত্ত্ব, অপ্রাকৃত জ্ঞান আরো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মূল তথ্য নীচে দেওয়া হল।

অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতের আরাধ্যদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আদিপুরুষ ও তাঁর পূর্ণ কলারূপে বিরাজ করেন। এই পুরুষ ও তাঁর পূর্ণ কলাসমূহকে দিব্য কার্যকলাপে যুক্ত ভক্তিযোগ বা প্রেমময়ী ভগবদ্‌সেবা দ্বারা জানা যায়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনিই সমগ্র অপ্রাকৃত, চিৎ-তত্ত্ব। প্রাকৃত তত্ত্ব ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব (জড় ও চেতন তত্ত্ব) এই পুরুষ থেকেই উদ্ভূত। সম্পূর্ণ বৃক্ষের তিনিই মূল। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করলে শাখা, পত্রসমূহ স্বতঃই পুষ্টি লাভ করে। একইভাবে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা হলে জড় জগতের সকল অংশই উজ্জীবিত হয় এবং জাগতিকভাবে কর্ম সম্পাদন ব্যতীতই ভক্তহৃদয় পরিপুষ্ট হয়। এটিই হল ভগবদ্‌গীতার রহস্য।

অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশের পন্থা ভৌতিক পন্থা থেকে ভিন্ন। জড় জগতে বসবাসকালীন অপ্রাকৃত কার্যাবলী অনুশীলনের মাধ্যমে অপ্রাকৃত লোকে খুব সহজেই যে কোন জীব প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যারা বস্তুতঃ ঘোর জড়বাদী, পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক সীমিত চিন্তাশক্তির,

মনোধর্মী শুষ্কতর্ক ও জড় বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল তাদের পক্ষে অপ্রাকৃত দিব্য লোকে প্রবেশ করা খুবই কঠিন। মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত স্পুটনিক, কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট আদির সাহায্যে অপ্রাকৃত লোক দিব্যধামে প্রবেশ করতে ঘোর জড়বাদীরা চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ঐরকম উপায়ে এমনকি জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকেও পৌছানো সম্ভব নয় এবং জড় জগত থেকে বহু বহু দুরে অবস্থিত অপ্রাকৃত, চিজ্জগতের আর কি কথা? অলৌকিক যোগ শক্তির অধিকারী যোগীদের পক্ষেও সেই দিব্য ধামে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। সিদ্ধযোগী যৌগিক শক্তির অনুশীলন দ্বারা এক বিশেষ উপযুক্ত মুহূর্তে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে প্রাকৃত জগৎ ও অপ্রাকৃত দিব্য ধামের সংযোগকারী বিশেষ পথের মধ্য দিয়ে অপ্রাকৃত দিব্য ধামে প্রবেশ করতে পারে। সম্ভব হলে ভগবদ্‌গীতায় প্রদত্ত নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী তারা তা করেন।

সূর্য যখন উত্তর কক্ষপথে ভ্রমণ করে অর্থাৎ উত্তরায়ণের সময় অথবা শুভক্ষণ যখন অগ্নিদেব ও জ্যোতি আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। সিদ্ধযোগী জড় দেহ ত্যাগ করে অপ্রাকৃত দিব্য লোকে উপনীত হতে পারেন।

ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেবতা রয়েছে। বিশ্বের প্রশাসনের জটিলতা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম মূর্খলোকেরা অগ্নি, জল, বিদ্যুৎ, দিন, রাত আদি দেবতাদের ব্যক্তিগত পরিচালনার ধারণা হাস্যকর বলে মনে করে। কিন্তু সিদ্ধ যোগীরা জানেন কিভাবে এইসব জাগতিক কার্যের অদৃশ্য পরিচালকদের তুষ্ট করা যায়; তাদের সদিচ্ছার সুযোগ নিয়ে স্বেচ্ছায় অপ্রাকৃত দিব্য জগতে বা জড় আকাশের সর্বোচ্চলোকে প্রবেশের ব্যবস্থা মতো সবচেয়ে সময়োপযোগী মুহূর্তে এই সকল যোগীরা তাদের জড় দেহ ত্যাগ করেন। জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে শত সহস্র বছর ধরে যোগীরা আরো আরামদায়ক ও

সুখপ্রদ জীবন উপভোগ করেন, তবে জীবন সেখানে নিত্য শাশ্বত নয়। পৃথিবী বা ভূলোকে বসবাসকারীদের জড় দৃষ্টির আড়ালে জাগতিক কার্যের পরিচালক দেবতাদের সৃষ্ট এক সময়োপযোগী মুহূর্তে যৌগিক শক্তির মাধ্যমে শাশ্বত, অনন্ত জীবনকামীরা অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতে প্রবেশ করে।

যারা যোগী নয় অথচ যজ্ঞ, দান, তপশ্চর্যাদি পুণ্যকর্ম প্রভাবে এক সময়োচিত মুহূর্তে মারা যায়, তারা উচ্চতর লোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু তারা এই ভূলোকে আবার ফিরে আসেন। সূর্য যখন তার কক্ষপথের দক্ষিণ মার্গে বা ধূম মাসের অর্ধেক সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে তখন তারা গমন করে।

সার কথা হল অপ্রাকৃত চিন্ময় লোকে প্রবেশের বাসনাকারীকে ভগবদ্‌গীতায় অপ্রাকৃত কর্ম বা ভগবদ্ সেবার পথ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। উত্তম ভক্তিযোগীদের নির্দেশ মতো যারা ভগবদ্ সেবার পথ গ্রহণ করেন অপ্রাকৃত চিন্ময় লোকে প্রবেশের চেষ্টায় তারা কখনও নিরাশ হন না। অনেক প্রতিবন্ধক থাকলেও ভক্তিযোগীদের প্রদর্শিত পথ কঠোরভাবে অনুসরণ করে কৃষ্ণভক্তরা সহজেই ঐ বাধাগুলি অতিক্রম করেন। এই রকম ভক্ত অপ্রাকৃত ভগবদ্ ধামে অগ্রসরের জীবনযাত্রায় কখনও বিভ্রান্ত হন না। চিন্ময় জগতে প্রবেশের জন্য ভগবদ্ভক্তির নিশ্চিত পথ গ্রহণকারী কেউই প্রবঞ্চিত বা হতাশ হন না। বেদপাঠ (স্বাধ্যায়), যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপশ্চর্যা ও দান আদি দ্বারা যে সমস্ত ফল লাভ হয়, সহজেই তা ভক্তিযোগ বা শুধুমাত্র ভগবদ্ সেবার মাধ্যমেই লাভ হয়।

এই জন্য ভক্তিযোগ হচ্ছে ভবরোগের ঔষধ, এই কলিযুগে বিশেষভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে মহান, উদার ও বদান্য অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (১৪৮৬-১৫৩৪) বাংলায় আবির্ভূত হয়ে ভগবানের দিব্য নামকীর্তন ও নৃত্যাদির মাধ্যমে সংকীর্তন আন্দোলন সারা ভারতে

প্রচার করে এই ভক্তিযোগের অনুশীলন খুব সহজ করে দিয়েছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় একজন সহজেই এই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। এইভাবে হৃদয়ের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হলে সংসার দাবানল নির্বাপিত হবে এবং দিব্য আনন্দের বর্ষণ হবে।

ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ে *বসুধা বিভূতি ভিন্নম্* এর যে বিবরণ রয়েছে তা এই জড় জগতের মধ্যেই। ভগবদ্‌গীতায়ও জানান হয়েছে যে শত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে বৈচিত্র্যময় লোকসমূহ রয়েছে আর এই সকল ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৃজনীশক্তির এক চতুর্থাংশ মাত্র। ভগবানের সৃজনীশক্তির তিন চতুর্থাংশ দিয়ে বৈকুণ্ঠলোক—চিদাকাশ প্রকাশিত। অপ্রাকৃত চিন্ময় লোকের অস্তিত্বের গবেষণার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত জড় বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্রহ্মসংহিতা ও ভগবদ্‌গীতার এইসব শিক্ষা দৃঢ় নিশ্চয় হবে।

২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ সালে মস্কো খবরে জানান হয় ঃ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিয়ার প্রখ্যাত অধ্যাপক বোরিস ভোরান্টসোভ ভেলিয়ামিনোভ (Boris Vorontosov) বলেন যে—ব্রহ্মাণ্ডে উন্নত চেতনাসম্পন্ন জীব সমন্বিত অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে।

রাশিয়ান মহাকাশচারীর এই উক্তি নীচের ব্রহ্মসংহিতার বিবরণকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে:

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতম্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মসংহিতার এই উদ্ধৃতি অনুযায়ী রাশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রতিপন্ন করেছেন অন্তরীক্ষে কেবল অসংখ্য গ্রহলোকই নেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডও আছে। এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডগুলি অসংখ্য লোক সহ অন্তরীক্ষে

ভাসমানই নয়; মহাবিষ্ণুর দিব্য দেহনিঃসৃত ব্রহ্মজ্যোতি থেকে তারা উদ্ভূত; যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ব্রহ্মা দ্বারা বন্দিত হন।

রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী এ-ও প্রতিপন্ন করেছেন যে কম করে হলেও ১ কোটি গ্রহলোকে জীব আছে। ব্রহ্মসংহিতাতে নির্দেশ করা হয়েছে যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটিতে অসংখ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রহলোকসমূহ রয়েছে। জীবতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ব্লাডিমির অল্পটভের এই অভিমত যে উপরিউক্ত গ্রহলোকগুলির কোন কোন গ্রহলোক গুলিতে এই পৃথিবীর মতো উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াকে সমর্থন করছেন। যা হচ্ছে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অভিমত। মস্কো থেকে আরও খবর এসেছে।

এমনও হতে পারে যে পৃথিবীর মতো ঐ সকল গ্রহলোকেও জীবনের বিকাশও হয়েছে। রসায়নের বিজ্ঞানী নিকোলাই ঐ গ্রহলোকের জলবায়ুর সমস্যা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, যেমন মঙ্গলগ্রহের নিম্নতাপমাত্রার জীবদেহ সাধারণভাবে খুব সহজেই থাকার উপযোগী। তিনি বলেন যে তার অনুভূতি হল মঙ্গলগ্রহের জলবায়ুর বায়বীয় সংগঠন সেখানকার প্রাণীসমূহের জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল যা ঐ আবহাওয়ার উপযোগী।

বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন গ্রহলোকে জীবসত্তার উপযোগিতাকে ব্রহ্মসংহিতায় *বিভূতি ভিন্নম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডগুলির অসংখ্য গ্রহলোকের প্রত্যেকটি এক বিশেষ পরিবেশ সম্পন্ন এবং সেখানকার আবহাওয়ার উৎকর্ষতা বা নিকৃষ্টতা অনুযায়ী জীবকুল বিজ্ঞান দর্শনাদিতে উন্নতশীল। 'বিভূতি' অর্থে বিশেষ ক্ষমতা, এবং 'ভিন্নম্' অর্থে ভিন্ন ভিন্ন। যান্ত্রিক উপায়ে অন্যান্য গ্রহলোকে পৌছনোর উদ্যোগে যারা অন্তঃরীক্ষ অভিযানে সচেষ্ট সেই বিজ্ঞানীদের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক যে পৃথিবীর পরিবেশের উপযোগী জীবসত্তা অন্য গ্রহলোকের পরিবেশে থাকতে অক্ষম। তাই মানুষের চন্দ্র, সূর্য বা মঙ্গল গ্রহে অভিযানের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হবে কেননা অন্যান্য গ্রহলোকে পরিবেশ-

আবহাওয়া বিভিন্ন। তবে ইচ্ছা হলে স্বতন্ত্রভাবে যে কোন গ্রহলোকে যাওয়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তা সম্ভব কেবল মানসিক ভাবনার পরিবর্তন দ্বারা। মন হচ্ছে জড় দেহের প্রধান ইন্দ্রিয়। এই জড় দেহের ক্রমবিবর্তন-প্রগতি তার মানসিক ভাবনার উপর নির্ভর করে। একটি কীটের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন হয়ে প্রজাপতিতে রূপান্তর এবং বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষ দেহ নারী দেহে রূপান্তর (বা তার বিপরীত) কমবেশী মানসিক ভাবনার উপর নির্ভরশীল।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে যদি কেউ মৃত্যুর সময় পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের রূপে মনকে আবিষ্ট করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত দিব্য ধামের চিন্ময় স্থিতিতে প্রবেশ করে। এর অর্থ হচ্ছে যে ভগবদ্ ভজনের নির্দিষ্ট বিধিগুলি পালনের মাধ্যমে জড় থেকে ভগবানের চিন্ময়রূপে মনকে শিক্ষা দিয়ে সহজেই ভগবদ্ধাম লাভ করতে পারেন। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এইভাবে কেউ আকাশে যে কোন গ্রহলোকে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে, দেহ ত্যাগ মাত্র তিনি সেখানে যেতে পারেন। কেউ চন্দ্র, সূর্য বা মঙ্গল গ্রহে যেতে চাইলে এই উদ্দেশ্যে কেবল উপযোগী কার্য অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি তা করতে পারেন। ভগবদ্‌গীতার নীচের বিবরণে এই তথ্যকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে—মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, মৃত্যুর পর তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

ভরত মহারাজ কঠোর তপস্যাময় জীবনযাপন করলেও, মৃত্যুর সময় হরিণের চিন্তা করায় দেহ ত্যাগের পর একটি হরিণ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যাই হোক, তিনি তার বিগত জীবনের ভগবদ্ ভাবনা বজায় রেখেছিলেন এবং নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। একজন ব্যক্তির সারা জীবনের কার্যকলাপ মৃত্যুর সময় তার চিন্তাভাবনাকে যে প্রভাবিত করে, তা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (তৃতীয় স্কন্ধ বত্রিশ অধ্যায়) চন্দ্রলোকে প্রবেশের উপায় নীচে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

ভগবদ্ ধামের তথ্য যাদের জানা নেই, সেই জড়বাদীরা সর্বদাই জাগতিক ধন, যশ, খ্যাতি লাভে প্রমত্ত। এইসব লোক তাদের সুখের জন্য নিজ পরিবার ভরণপোষণের উন্নতিতে আগ্রহী থাকে এবং তারা সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণের প্রগতিতেও আগ্রহশীল থাকে। এইসব লোক জড় জাগতিক কার্যাবলী দ্বারা তাদের ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে। এরা শাস্ত্র নির্দিষ্ট কার্যকলাপে যান্ত্রিকভাবে নিযুক্ত থাকে এবং তাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট যজ্ঞ অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের তুষ্ট করতে ইচ্ছুক। এইরকম যজ্ঞ ও কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে আসক্ত জীবাত্মা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে প্রবেশ করে। চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে সে স্বর্গীয় পানীয় সোমরস পানের ক্ষমতা লাভ করে। এই গ্রহলোকের অধিষ্ঠাতা হচ্ছেন চন্দ্রদেব। সেখানকার পরিবেশ ও জীবন উপভোগ্য উপকরণ এই পৃথিবী থেকে অনেক বেশী আরামদায়ক, মনোরম ও সুবিধাজনক। জীব আরও ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তির সুযোগ ব্যবহার না করলে, চন্দ্রলোক প্রাপ্তি সত্ত্বেও তার অধঃপতন হয়, সে পৃথিবী আদি গ্রহলোকে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। তবে জড়বাদীরা সর্বোচ্চ লোক প্রাপ্ত হলেও সমগ্র জড় প্রকাশের প্রলয়ের সময় ঐ জড়বাদীরাও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

চিদাকাশ সম্বন্ধে বলা যায় পরব্যোমে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোকসমূহ রয়েছে। বৈকুণ্ঠসমূহ হচ্ছে ভগবানের অন্তঃরঙ্গা পরাশক্তি সম্ভূত চিন্ময়লোক এবং ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি জড়াকাশের গ্রহলোকের অনুপাতে এই চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকগুলি তাদের তিনগুণ। এইভাবে ভগবানের সৃষ্টির সবচেয়ে নগণ্য এই পৃথিবীতে রাজনৈতিক সামঞ্জস্য সাধনে দুর্ভাগা জড়বাদীরা ব্যস্ত। এই পৃথিবীর কথা কিছুমাত্র না বলেও, সমগ্র ছায়াপথ সমূহের অসংখ্য গ্রহলোক সমূহসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে তুলনায় সরিষাপূর্ণ এক বস্তা সরিষার একটি মাত্র দানা। কিন্তু

দুর্ভাগা জড়বাদীরা এখানে আরামে জীবন উপভোগের পরিকল্পনা করে মানবজীবনের বহু মূল্য শক্তিসামর্থ্যের অপচয় করে, যা পরিণামে নিশ্চিতভাবে নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়ে যায়। মনোধর্মী শুষ্ক তর্কপন্থায় সময়ের অপচয় করবার পরিবর্তে সাধারণ জীবন ও উচ্চ ভগবদ্ ভাবনার মাধ্যমে একজন নিরন্তর জড় জাগতিক অশান্তি থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

এমনকি একজন জড়বাদী উন্নত ভৌতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে ইচ্ছুক হলেও পৃথিবী থেকে বহুগুণ উন্নত ভৌতিক সুখভোগ যেখানে পাওয়া যায় সেই গ্রহলোকসমূহ সে লাভ করতে পারে। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে দেহত্যাগের পর চিদাকাশে ফিরে যাওয়ার প্রয়াস করা। যাই হোক, কেউ যদি জাগতিক ভৌতিক সুবিধা ভোগ করতে ইচ্ছুক হয়, যৌগিক শক্তির প্রয়োগ দ্বারা সে জড়াকাশের গ্রহান্তরে স্থানান্তরিত হতে পারে। মহাকাশচারীদের খেলার স্পুটনিক শিশুসুলভ বিনোদন ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা তা কোন কাজের নয়।

ভৌতিক জড় দেহস্থ বায়ুর গতি নিয়ন্ত্রণ শিক্ষাদায়ক হওয়ার অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনাও ভৌতিক পন্থা। চিৎ স্ফুলিঙ্গ আত্মা দেহস্থ বায়ুতে ভাসমান এবং আত্মা বিরাজিত বায়ুর ঢেউগুলি হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস। তাই যোগসাধনা হল বায়ু নিয়ন্ত্রনের একটি কৌশলমাত্র, যার মাধ্যমে উদর থেকে নাভি, নাভি থেকে বক্ষ, বক্ষ থেকে কণ্ঠদেশ, সেখান থেকে চক্ষু গোলকে, তারপর ব্রহ্মরন্ধ্রে এবং সেখান থেকে ঈপ্সিত যে কোন গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হওয়া যায়। জড় বিজ্ঞানীরা বায়ু ও আলোকের গতিবেগ নির্ধারণ করেন, কিন্তু মন ও বুদ্ধির গতিবেগ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই। মনের গতিবেগ সম্বন্ধে আমাদের কিছু সীমিত অভিজ্ঞতা আছে, কেননা মুহূর্ত মধ্যে শত সহস্র মাইল দূরে আমরা মনকে স্থানান্তরিত করতে পারি। মনের চেয়ে বুদ্ধি আরো সূক্ষ্ম। বুদ্ধির চেয়েও সূক্ষ্ম হল আত্মা বা চিৎকণ, যা মন ও বুদ্ধির মতো

জড় নয়। পরাপ্রকৃতি এই চিৎপরমাণু আত্মা বুদ্ধির চেয়ে শত সহস্রগুণ সূক্ষ্ম ও প্রবল। তাই এইভাবে আত্মার গ্রহান্তর পরিভ্রমণের গতিবেগ আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি। আত্মা কোনো ভৌতিকযানের সাহায্য ছাড়াই নিজ শক্তির দ্বারা পরিভ্রমণ করে, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণময় পাশবিক সভ্যতা আধুনিক মানবকে বিপথগামী করে তার আত্মার এত প্রবল শক্তিমত্তার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে যে আত্মা হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র বা বিদ্যুতের চেয়ে অনেক অনেক গুণ আলোকোজ্জ্বল, দীপ্তিময়, প্রচণ্ড বলশালী। দুর্লভ মানব জীবন বিফল হয়, যদি সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি না করে। এইরকম বিভ্রান্তকারী সভ্যতা থেকে মানুষকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে সপার্ষদ নিত্যানন্দ প্রভু সহ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগতে আবির্ভূত হন।

যোগী কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহলোকে ভ্রমণ করতে পারে শ্রীমদ্ভাগবতে তার বর্ণনা আছে। যখন জীবনীশক্তিকে লঘু মস্তিষ্কে উন্নীত করা হয়, তখন চোখ, নাক, কান আদি দিয়ে প্রবলবেগে তা বেরিয়ে যাওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে কেননা এই স্থানগুলিকে এই শক্তির সপ্তম চক্র বলে। সম্পূর্ণ বায়ুরোধ দ্বারা যোগীরা কিন্তু এই রন্ধ্রদ্বারগুলি নিরুদ্ধ করে দিতে পারেন। তখন যোগী মধ্যচক্রে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে কেন্দ্রীভূত করেন। দেহত্যাগের পর যোগী কোন্ গ্রহলোকে প্রবেশে ইচ্ছুক, এই অবস্থায় যোগী তা চিন্তা করেন। তখন তিনি মনস্থির করতে পারেন। যেখানে গেলে এই জড় জগতে তার আর ফিরে আসতে হবে না। তিনি কি সেই অপ্রাকৃত দিব্যধাম বৈকুণ্ঠলোক, কৃষ্ণের ধামে যেতে চান্, না—জড় জগতের ঊর্ধ্বলোকে যেতে চান্। সিদ্ধযোগী তার যেমন ইচ্ছা ঐ লোকসমূহের যে কোনটিতে যেতে পারেন।

যিনি উপযুক্ত ভাবনায় দেহত্যাগে সাফল্য অর্জন করেছেন, সেই সিদ্ধযোগীর পক্ষে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিজেকে স্থানান্তরিত করা এক সাধারণ মানুষের মুদীর দোকানে হেটে যাওয়ার মতোই সহজসাধ্য। ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে যে, জড় দেহটি আমাদের চিন্ময় আত্মার একটি আবরণ। মন ও বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ। আর মাটি, জল, বায়ু আদিতে তৈরি স্থূল দেহটি হল আত্মার বহিরাবরণ। তাই যে কোন উন্নত জীব, যিনি যৌগিক পন্থায় আত্মবিদ্ হয়েছেন। যিনি জড় ও চেতনের সম্বন্ধ জানেন, তিনি স্বেচ্ছায় সুষ্ঠুভাবে আত্মার স্থূল দেহ ত্যাগ করতে পারেন। ভগবদ্ কৃপায় আমাদের পূর্ণ স্বতন্ত্রতা আছে। ভগবান আমাদের প্রতি সদয় হওয়ায় স্বেচ্ছায় পরব্যোম বা চিদাকাশে যে কোন স্থানের যে কোন গ্রহলোকে আমরা বসবাস করতে পারি। তবে এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলে জড় জগতে পতন হয় এবং বদ্ধ জীবনের ত্রিতাপ দুঃখ দুর্দশা ভোগ করতে হয়। মিলটন রচিত প্যারাডাইস লস্ট (Paradise Lost) গ্রন্থে আত্মার পছন্দমতো জড় জগতে দুঃখময় জীবন যাপনের সুন্দর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। সেইরকম আত্মা স্বেচ্ছায় আবার ভগবদ্ধাম লাভ করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে।

সঙ্কটকালীন মৃত্যুর সময় প্রাণবায়ুকে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে স্থাপন করে, ইচ্ছামতো সে যেখানে খুশি যেতে পারে। জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে অনিচ্ছুক হলে মুহূর্ত সময়ে চিন্ময় পরিবেশে তার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত সিদ্ধ চিদ্দেহে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে তিনি উপস্থিত হতে পারেন। কেবল জড় জগতে তার সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাধি ত্যাগের ইচ্ছা করতে হবে এবং তারপর প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করে দেহত্যাগ করতে হবে। যোগ অনুশীলনে এই হচ্ছে সর্বোত্তম সাফল্য, সর্বোচ্চ সিদ্ধি। অবশ্য মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে এবং এইজন্য সে যদি জড় জগৎ থেকে মুক্ত হতে না চায়, তাহলে সে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার

কীর্তন কালীন দশটি নামাপরাধ আছে। যতদূর সম্ভব এইগুলি ত্যাগের চেষ্টা করা চাই তবে যে কোন উপলক্ষে পবিত্র ভগবন্নাম কীর্তন সদা-সর্বদাই চেষ্টা করা কর্তব্য।

৩। দিব্য ভাগবত কথামৃত আস্বাদন করা উচিত, ভাগবত পাঠ অনুষ্ঠানে ভক্ত ভাগবতের কাছে গ্রন্থ ভাগবতের প্রামাণিক কথা শ্রবণ সম্ভব।

৪। কৃষ্ণ জন্মস্থান, মথুরায় বাস করা উচিত, অথবা শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সদ্‌গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হয়ে পরিবারের সকলে বিগ্রহোপাসনার মাধ্যমে গৃহে মথুরার মতো পবিত্র তীর্থের পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত।

৫। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে এমনভাবে শ্রীবিগ্রহ-সেবা করা উচিত যাতে গৃহের সমগ্র পরিবেশ ভগবদ্ ধামের প্রতীক হয়ে উঠে। যিনি দিব্য ভগবদ্ উপাসনায় পারঙ্গত ও প্রার্থীকে উপযুক্ত পন্থা প্রদর্শন করতে পারেন সেই সদ্‌গুরুর নির্দেশ দ্বারা তা সম্ভব।

উপরের পাঁচটি নিয়ম বিশ্বের যে কোন স্থানের যে কেউ গ্রহণ করতে পারবেন।

এই যুগে বিশেষভাবে পতিতদের উদ্ধারের জন্য যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো অধিকারী আচার্য দ্বারা স্বীকৃত সরল পদ্ধতি অনুসরণ করে যে কেউ এইভাবে ভগবানের দিব্যধামে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত বিবরণের জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতো শাস্ত্র পাঠ করা উচিত। পরব্যোমের দিব্যধামে স্থানান্তরিত হওয়ার সমগ্র পন্থা হল চিন্ময় আত্মার স্থূল ও সূক্ষ্ম ভৌতিক উপাধির কাজ সমাপ্ত করা। উপরে উল্লেখিত ভগবদ্ সেবার পাঁচটি বিধির পারমার্থিক বল এতই প্রাণবন্ত যে এক উন্নত ভক্ত আন্তরিকভাবে ঐ বিধিগুলির অনুষ্ঠানে এমনকি প্রাথমিক স্তরেও ভাব এর স্তরে উন্নীত হবেন। যা মানসিক জল্পনা কল্পনা ও শুষ্ক তর্ক পন্থার অতীত। ভৌতিক সংসারাশ্রম

ত্যাগ করবার পর সম্পূর্ণ ভাবাবিষ্ট বা ভগবদ্ প্রেম লাভে পরব্যোম চিজ্জগতে স্থানান্তরিত হন। এমনকি স্থূল জড় শরীরে অবস্থান কালেও ভগবদ্ প্রেমে সিদ্ধিলাভে বস্তুতঃ চিন্ময় স্থিতি প্রাপ্তি হয়। আগুনের সংস্পর্শে জ্বলন্ত লৌহের অবস্থা যেমন হয় আর লৌহধর্ম থাকে না, আগুনের ধর্ম প্রাপ্ত হয়, তারও ঐ রকম অবস্থা হয়। জড় বিজ্ঞানের পরিমাপ ক্ষমতার অতীত ভগবানের উপদিষ্ট ও অচিন্ত্য বিভূতির দ্বারাই যা সম্ভব হয়। এইজন্য অখণ্ড বিশ্বাসে ভগবদ্ সেবায় নিয়োজিত হওয়া উচিত। ভাবনা, চিন্তার, মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে উন্নত মানের ভক্তের প্রকৃষ্ট সঙ্গ অন্বেষণ করা চাই যাতে বিশ্বাস অবিচলিত হয়। এই রকম সাধু সঙ্গই যথার্থ ভগবদ্ভক্তি বিকাশের সহায়ক হয়। বিদ্যুতালোকের মতো সকল জড় জাগতিক অনর্থ দূরীভূত করবে। চিন্ময় প্রতীতির এই সব বিভিন্ন স্তর ভগবদ্ ধাম প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং অনুভব করবেন। আর এর ফলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হবে যে তিনি অপ্রাকৃত সনাতন দিব্য ধামের পথে প্রগতি লাভ করছেন। তখন তিনি আন্তরিকভাবে ভগবানে ও তাঁর সনাতন ধামে আসক্ত হবেন। ভগবদ্ প্রেম উন্মেষের এই রকমই হল ক্রমপন্থা। এই ভগবদ্ প্রেমের বিকাশই মানব জীবনের পরম প্রয়োজন।

যারা এই পন্থায় সিদ্ধি লাভ করেছেন মহারাজা, ঋষিসহ বহু মহাজনদের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রয়েছে। অধ্যবসায় ও বিশ্বাসে ভগবদ্ভক্তির এমনকি একটি মাত্র অঙ্গ যাজন করে কেউ কেউ সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাদের কয়েকজনের নামের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। কেবল শ্রবণের মাধ্যমে শুকদেব গোস্বামীর মতো আচার্যের কাছে মহারাজ পরীক্ষিৎ চিন্ময় স্থিতি লাভ করেন।

২। মহান পিতা ব্যাসদেবের নিকট প্রাপ্ত অপ্রাকৃত দিব্য বাণী শুধু অবিকল আবৃত্তি করে শুকদেব গোস্বামী সেই পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেন।

৩। ভক্তপ্রবর দেবর্ষি শ্রীনারদমুনি দত্ত উপদেশামৃত নিরন্তর স্মরণের মাধ্যমে প্রহ্লাদ মহারাজ পারমার্থিক সাফল্য অর্জন করেন।

৪। শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ভগবানের পাদপদ্মে উপবেশন করে, তাঁর পাদসেবন করেই ঐ সিদ্ধি লাভ করেন।

৫। ভগবদ্ অর্চন দ্বারা মহারাজ পৃথু ভক্তিমার্গে সিদ্ধি লাভ করেন।

৬। ভগবদ্ বন্দনার মাধ্যমেই অক্রুর ভক্তি রাজ্যের সাফল্য অর্জন করেন।

৭। শ্রীরামভক্ত মহাবীর হনুমান ভগবদ্ আদেশ পালন করেই এই পথে সফল হন।

৮। ভগবদ্ গীতার দিব্য জ্ঞান অর্জুন ও অনুগামীদের প্রদাতা ভগবানে সখ্যভাব দ্বারা মহাবীর রণবীর অর্জুন সেই সাফল্য অর্জন করেন।

৯। আত্মনিবেদন সহ সবকিছুই ভগবচ্চরণে সমর্পণ করে মহারাজ বলী ভক্তিমার্গে সিদ্ধি লাভ করেন।

ভগবদ্ ভজনের এই হচ্ছে নয়টি অঙ্গ এবং ভক্তিপ্রার্থী এক, দুই, তিন, চার বা সব ক'টি অঙ্গই গ্রহণ করতে পারেন। জড় জাগতিক স্তরে পরিমাণগত বা গুণগত বিভিন্নতার উর্ধ্বে অদ্বয়জ্ঞানের সকল সেবাই স্বয়ং অদ্বয়তত্ত্ব; পূর্ণতত্ত্ব, অখণ্ডতত্ত্ব। চিন্ময় স্তরে সবকিছুই এক ও অভিন্ন; দিব্য, অপ্রাকৃত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মহারাজ অম্বরীষ উপরে উল্লেখিত ভক্তির সকল অঙ্গ যাজন করেন এবং ভক্তি পথে সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁর মনকে ভগবানের পাদপদ্মে তাঁর বাণী ভগবদ্ধামের মহিমা কীর্তনে, তাঁর হাত ভগবদ্ মন্দির মার্জনায়, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী শ্রবণে, তাঁর চোখ দুটি ভগবদ্ শ্রীবিগ্রহ দর্শনে, তাঁর দেহটি ভগবদ্ ভক্তের শরীর স্পর্শনে, তাঁর নাসিকা ভগবদ্ অর্পিত পুষ্পের সুগন্ধ ঘ্রাণে, তাঁর জিহ্বা ভগবদ্ প্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর পদদ্বয় ভগবদ্ মন্দির দর্শনে, ইন্দ্রিয় ভোগে সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ হয়ে

জীবনের সমস্ত শক্তি ভগবদ্ সেবায় নিয়োগ করেন। জড় বিজ্ঞানে সমস্ত নৈপুণ্যকে ধিক্কার দিয়ে এইসব দিব্য ভগবদ্ সেবা মানব জীবনের পরম পূর্ণতা লাভে সহায়ক হয়েছে।

জীবনে সিদ্ধি লাভের জন্য আত্মোপলব্ধির এই বিধি গ্রহণ তাই সকল মানবের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। মানব জীবনের একমাত্র দায়িত্ব হল আত্মোপলব্ধি, নিজেকে জানা। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান যুগে মানব সমাজ জাতীয় কর্তব্য সাধনে অতীব ব্যস্ত। বস্তুতঃ যারা পারমার্থিক দায়িত্বজ্ঞানহীন কেবল তারাই জাতীয় কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য ও মানবহিতৈষী কর্তব্য সাধনে দায়বদ্ধ। জন্ম হওয়া মাত্র মানুষের শুধু জাতীয়, সামাজিক এবং মানবহিতৈষী দায়দায়িত্ব থাকে না, যারা জগতে বায়ু, জল ও আলোক সরবরাহ করেন তাদের প্রতি আমাদের দায়দায়িত্ব থাকে। আদর্শ জীবনপথে যথার্থ নির্দেশের যে মহান ঋষিরা বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন তাঁদের প্রতিও মানবের দায়িত্ব আছে। সব রকম জীবের প্রতি, পিতৃপুরুষের প্রতি, পরিবার পরিজনাদির প্রতিও তার দায়দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু একটি মাত্র দায়িত্ব, পারমার্থিক সিদ্ধির কর্তব্যে স্বয়ং নিযুক্ত হওয়া মাত্র, অন্য প্রচেষ্টা ছাড়াই তাঁর সকল দায়দায়িত্বের স্বতঃই হিসাবনিকাশ শেষ হয়ে যায়।

ভগবদ্ভক্ত কখনও সমাজের কাছে বিরক্তির পাত্র নয় পক্ষান্তরে তিনি মানব সমাজের এক মূল্যবান সম্পদ। ইহকাল ও পরকালে সমাজের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামীদের জন্য অপরিমেয় নিঃস্বার্থ সেবা করতে পারেন যখনই এক ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত হন। কেননা কোন সজ্জন ভক্তই পাপকর্মে আসক্ত হন না। তবু এইরকম ভক্ত কোন অপরাধ করলেও ভগবান স্বয়ং তৎক্ষণাৎ তার সংশোধন করেন। এই কারণে ভক্তের জড় জাগতিক বিদ্যা যেমন কোন প্রয়োজন নেই, তেমনই সর্বত্যাগী হয়ে তপোবনবাসী হওয়ারও তাঁর কোন দরকার নেই। তিনি কেবল স্বগৃহে অবস্থান করেই জীবনের যে কোন বর্ণাশ্রমে অবস্থান করে

হরিভজন করতে পারেন। কেবল ভগবদ্ সেবার মাধ্যমে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তির দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রয়েছে। বাহ্যিক প্রয়াস ছাড়াই একজন শুদ্ধভক্তের জীবনে স্বাভাবিকভাবেই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিকাশ হয়।

ভগবদ্ভক্তি তত্ত্ব ভারতীয় ঋষিদের সারা বিশ্বের কাছে এক শ্রেষ্ঠ অবদান। এইজন্য যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের প্রত্যেকে এই মহান তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তাঁর জীবনে সিদ্ধি লাভ করবার দায়িত্ব রয়েছে এবং এখনও জীবনের অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ জগতের অন্য লোকদের বিতরণ করবার দায়িত্ব রয়েছে। মানব সমাজ ক্রমশ জ্ঞান বিকাশের মাধ্যমে জীবনের এই সিদ্ধির স্তরে পৌঁছাবেই। তবে ভারতীয় ঋষিরা এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পৌঁছিয়েছেন। এই উচ্চ শিখরে পৌঁছতে হাজার হাজার বছর কেন অপেক্ষা করতে হবে? তাই তাদের সময় ও শক্তি অপচয় থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে এই তথ্য এক সুষ্ঠু পন্থায় তাদের দেওয়া হবে না কেন? যা লাভ করতে হয়তো তাদের লক্ষ বছর কঠোর শ্রম করতে হত। এক জীবনে তারা তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

অধুনা এক রাশিয়ান উপকথা রচনাকার বিশ্বে আভাষে জানাচ্ছেন যে বিজ্ঞান মানবকে চিরজীবী হতে সহায়তা করবে। অবশ্য, একজন সৃষ্টিকর্তা, পরম ব্রহ্মে তিনি বিশ্বাস করেন না। তবু জগতবাসীকে তার অভিমত জানানোয় আমরা তাকে স্বাগত জানাই কেননা আমরা জানি যে বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতির ফলে মানুষ নিশ্চয় চিন্ময় সনাতন ধাম লাভ করবে এবং বিজ্ঞানীদের জানাবে যে সমস্ত জাগতিক বৈজ্ঞানিক ধারণার অতীত, সর্বশক্তিমান এক পরম স্রষ্টা আছেন। প্রত্যেক জীবই স্বরূপতঃ নিত্য, শাশ্বত বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, কিন্তু তার স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিবর্তন করতে হয়। আর এই পরিবর্তন পন্থাকে জন্ম ও মৃত্যু বলে। মানুষকে এই ভৌতিক বন্ধন শৃঙ্খলে পড়তেই হবে,

এমনকি সংসার জীবনে সর্বোচ্চ অবস্থায়ও যা চলে আসছে, এই পরিবর্তন পন্থা জন্ম-মৃত্যু থেকে তার রেহাই নেই। জল্পনা-কল্পনায় নিপুণ, রাশিয়ান উপকথা রচনাকার যতই কল্পনা করুন, প্রকৃতির নিয়ম-বিধি সম্বন্ধে যাদের কিছু জ্ঞান আছে, এই রকম প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিরা জড় জগতে মানুষের চিরজীবী হওয়ার কথায় কখনই একমত হবেন না।

একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী কেবল একটি ফলকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জড়া প্রকৃতির সাধারণ গতিপর্যায় বুঝতে পারেন। একটি ছোট্রফল একটি ফুল থেকে উৎপন্ন হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বৃক্ষশাখায় কিছুকাল থাকে, পূর্ণ বিকশিত হয়, পাকে, তারপর অবশেষে বৃক্ষ থেকে পতনের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে, ভূমিতে পড়ে পচতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে মাটির সঙ্গে মিশে যায়, ভূমিতে বীজ পড়ে থাকে; বীজ থেকে এক বৃক্ষ। যথা সময়ে বৃক্ষ ফল উৎপন্ন করে, যা সবই ঐ একই গতি প্রাপ্ত হয়, এইভাবে চলে।

সেইরকম এক জীব সত্তা (এক চিৎ স্ফুলিঙ্গ রূপে পরম সত্তার এক অংশ) ঠিক গর্ভাধানের পরই এক মাতৃগর্ভে তার জৈব রূপ পরিগ্রহ করে। জীব সত্তা অল্প অল্প করে গর্ভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, জন্ম লাভ করে, তারপর আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে এক শিশু, বালক, যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক, বৃদ্ধ হয়। উপকথা রচনাকারের সকল শুভেচ্ছা ও আশার আকাশকুসুম কল্পনা সত্ত্বেও অবশেষে অন্তিমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তুলনামূলক বিচারে মানুষ ও ফলে কোন পার্থক্য নেই। ফলের মতো অপ্রকটের পর মানুষ বীজ রূপে তার অনেক সন্তান রেখে যায়। তবে জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী সে তার ভৌতিক শরীরে অনন্ত কাল ধরে থাকতে পারে না।

জড়া প্রকৃতির কঠোর বিধানকে কি করে একজন উপেক্ষা করতে পারে? বিজ্ঞানী যতই গর্ব, দম্ভ প্রকাশ করুক, প্রকৃতির কঠোর নিয়ম-বিধি সে পরিবর্তন করতে অক্ষম। জ্যোতির্বিদ বা বিজ্ঞানী গ্রহের

কক্ষপথ পরিবর্তন করতে পারে না, তুচ্ছ, সামান্য এক খেলনা যাকে সে এক উপগ্রহ বলে, তা তৈরি করতে পারে মাত্র, নির্বোধ শিশুরা এগুলির দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে এবং আধুনিক কৃত্রিম উপগ্রহ, স্পুটনিক আবিষ্কারকদের অনেক সম্মান দিতে পারে কিন্তু মানবসমাজে যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিরা, বিজ্ঞানীরা যার সংখ্যা নির্ণয় করতে অক্ষম সেই বিশাল সূর্য, নক্ষত্র, তারকা ও গ্রহের সৃষ্টিকর্তাকে আরো বেশী সম্মান জানাবে, প্রশংসা করবে। রাশিয়া বা আমেরিকায় যদি এক খেলনা কৃত্রিম উপগ্রহের একজন নির্মাতা থাকে, তা হলে পরব্যোমের চিদ্ আকাশে বিশাল উপগ্রহগুলির সৃষ্টিকর্তা থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এক খেলনা উপগ্রহ তৈরি করতে ও তাকে কক্ষপথে ভ্রমণের জন্য কত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কের প্রয়োজন হয়? তাহলে কি প্রকার সূক্ষ্ম ও সিদ্ধ মস্তিষ্ক অসংখ্য তারকার মহাসমাবেশ ও তাদের কক্ষপথে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন? এ পর্যন্ত ভগবানে অবিশ্বাসীরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে নি।

নাস্তিক শ্রেণীর লোকেরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের যে নিজস্ব মতবাদ উথাপন করে তা সচরাচর ফলতঃ এই রকম এটা দুর্বোধ্য, "আমাদের কল্পনাতীত", "তবু খুব সম্ভব," "এটা অবিচিন্ত্য", ইত্যাদি অভিমত ব্যক্ত করেন। এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে যে তাদের তথ্যের কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই এবং তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ লব্ধ তালিকাসূচী দ্বারা সমর্থিত নয়, বিজ্ঞানীরা কেবল জল্পনা-কল্পনা করেন, অনুমান করেন। যাই হোক্ এই সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য বিবরণ ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। যেমন ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই জড় জগতে এমন জীবসমূহ আছে যাদের আয়ুষ্কাল ৪,৩০০,০০০×১,০০০×২×৩০×১০০ সৌর বৎসর। আমরা ভগবদ্গীতাকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করি কেননা শঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো ভারতের

মহান ঋষিরা এই শাস্ত্র গ্রন্থটিকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছেন। ভগবদ্গীতা থেকে জানা যায় যে জড় জগতের অংশীভূত সকল জীবসত্তার আকারই তাদের জীবনকাল নির্বিশেষে ক্ষয়িষ্ণু ও বিনাশী।

তাই সমস্ত জড় আকারই পরিবর্তনশীল যদিও প্রকৃতিগতভাবে জড়া শক্তি সংরক্ষিত হয়। শক্তিবিচারে সব কিছুই সনাতন কিন্তু এই জড় জগতে জড় পদার্থ আকার ধারণ করে, কিছুকাল তার স্থিতি হয়, তা পরিণত অবস্থা লাভ করে, বৃদ্ধ হয়, তারপর সে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অবশেষে আবার অন্তর্হিত হয়। সকল জড় পদার্থই এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়, জড়বাদীরা জানাচ্ছে যে আমাদের দৃষ্টি সীমার অতীত এক অদ্ভুত, অচিন্ত্য, কোন অন্য রূপ রয়েছে যা এই জড়াকাশের অতীত যা চিদাকাশের এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত। যাইহোক, মূল চিৎ প্রকৃতি, চিৎ তত্ত্ব আরো কাছে কেননা সমস্ত জীবের মধ্যেই তা সক্রিয়। যখন চিৎতত্ত্ব, চিৎ প্রকৃতি দেহের বাইরে তখন জড় দেহ নিষ্প্রাণ। যেমন একটি শিশুর দেহের অভ্যন্তরে চিৎ প্রকৃতি রয়েছে এবং তাই তার দেহের আকার পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার দেহের বিকাশ হচ্ছে কিন্তু চিন্ময় আত্মা দেহত্যাগ করলে দেহের বিকাশ হয় না, এই প্রাকৃতিক নিয়ম সমস্ত প্রাকৃত তত্ত্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আত্মার চিৎ প্রকৃতির সংস্পর্শে যখন জড়া প্রকৃতি আসে তখন এইভাবে তার আকার পরিবর্তিত হয় অন্য আকার সে লাভ করে, আত্মা বা চিৎ প্রকৃতি ছাড়া এই আকার বা রূপ পরিবর্তিত হয় না। সমস্ত জড় বিষয়ই এই পথে পর্যায়ক্রমে বিকশিত হচ্ছে, বিকাশ লাভ করছে। ভগবানের চিৎ প্রকৃতি হওয়ায় এই গুণাতীত প্রকৃতি থেকেই এর উদ্ভব। আর তা বিকাশ লাভ করে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদির মতো বিশাল রূপ লাভ করে। আর সমগ্র গ্রহমণ্ডল চোদ্দটি ভাগে বিভক্ত এবং গুণবিচারে তারা বিভিন্ন, কিন্তু এই বিকাশ লাভের একই নীতি সকলের ক্ষেত্রে সত্য। চিৎশক্তি হচ্ছে স্রষ্টা আর এই চিৎ শক্তি দ্বারাই একমাত্র সম্পূর্ণ আকারের রূপান্তর, পরিবর্তন এবং বিকাশ ঘটে।

অনেক মূর্খরা দাবি করে যে জীবন শুধু এক রাসায়নিক মিশ্রণের মতো জড় বিকার দ্বারা সৃষ্টি—নিশ্চয়ই তা নয়। জীবশক্তিকে স্থান দিতে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকারী এক উন্নততর সত্তা দ্বারা জড়ীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয়ে উঠে গতিশীলতা প্রাপ্ত হয়। এক চিন্ময় সত্তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা যা নির্ধারিত সেই এক উন্নততর উৎকৃষ্ট শক্তি জড় বস্তুকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করেন। যেমন গৃহ নির্মাণের উপাদানগুলি স্বতঃই মিশ্রিত হয়ে হঠাৎ এক আবাসগৃহের আকার ধারণ করে না। জীবন্ত চিন্ময় সত্তা তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা জড় দ্রব্যকে যথাযথভাবে চালনা করে, এইভাবে সে তার গৃহ নির্মাণ করে। সেই রকম জড় পদার্থ হচ্ছে উপাদান মাত্র, কিন্তু চিন্ময় আত্মা হচ্ছে স্রষ্টা। যথার্থ জ্ঞানহীনরাই এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় না। স্রষ্টা আমাদের দৃষ্টির আড়ালে আছে বলে, তার অর্থ এই নয় যে, কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। ব্রহ্মাণ্ডের সুবিশাল আকার দেখে শুধু বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়, পক্ষান্তরে এক পরম বুদ্ধিমত্তার বিচারে শিক্ষা লাভ করা বরং উচিত। পরম সত্তাই হচ্ছেন অন্তিম সৃষ্টিকর্তা, সর্বাকর্ষক, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সৃষ্টিকর্তার প্রামাণিক তথ্য সম্বন্ধে কেউ হয়তো অজ্ঞ থাকতে পারে। ভগবদ্গীতা, বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের মতো বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু তা দেওয়া আছে।

মহাকাশে যখন এক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়, একটি শিশু হয়তো বুঝতে পারে না যে এর পেছনে বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক রয়েছে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে পৃথিবী থেকে বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক এই উপগ্রহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সেইরকম সৃষ্টিকর্তা এবং চিজ্জগতে তাঁর নিত্য ধাম সম্বন্ধে স্বল্পমেধা ব্যক্তিদের কোন তথ্য জানা নেই যা আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে অনেক অনেক দূরে। এই চিদাকাশ বস্তুতঃ আছে এবং এই চিন্ময় গ্রহলোকগুলি আয়তনে অনেক বিশাল এবং জড় আকাশের গ্রহলোকের তুলনায় সংখ্যায় অনেক বেশি।

ভগবদ্গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে সৃষ্টির এক চতুর্থাংশ দিয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ড তৈরি। শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই তথ্যের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম এবং রাসায়নিক মিশ্রণ দ্বারা বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগারে জীবশক্তি সৃষ্টি করা গেলে, গর্ব-উদ্ধত জড় বিজ্ঞানীরা জীবন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি কেন? তাদের অবশ্য জানা উচিত চিন্ময় আধ্যাত্মিক শক্তি জড় পদার্থ থেকে বিভিন্ন এবং কোন প্রকার ভৌতিক সমন্বয় দ্বারা ঐ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। অধুনা রাশিয়ান ও আমেরিকানরা নিঃসন্দেহে প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অনেক বিভাগে খুবই উন্নত কিন্তু আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে তারা এখনও অজ্ঞ। এক আদর্শ এবং প্রগতিশীল মানব সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে তাদের উৎকৃষ্ট বুদ্ধিমত্তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রাশিয়ানরা জানে না যে আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ দর্শনের বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতে রয়েছে। ভাগবতে বলা হয়েছে কৃষিজ, খনিজ ইত্যাদি যা কিছু প্রকৃতিজ সম্পদ আছে, তা পরম স্রষ্টার সৃষ্টি এবং তাতে প্রত্যেকটি জীবেরই ভোগ করবার অধিকার আছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে এক ব্যক্তির নিজ দেহ ভরণপোষণের যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন ততটুকুতেই মাত্র তার অধিকার আছে। আর সে যদি তার চেয়ে বেশি কামনা করে বা তার বরাদ্দ অংশের বেশি সে গ্রহণ করে। তাহলে সে দণ্ডাধীন হবে। আরো বলা হয়েছে যে পশুদের সঙ্গে নিজ সন্তান-সন্ততিদের মতো ব্যবহার করা উচিত।

আমাদের বিশ্বাস যে বিশ্বের কোন জাতিই সমাজতন্ত্রবাদকে শ্রীমদ্ভাগবতের মতো এমন সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। স্রষ্টা এবং জীবের যথার্থ স্বরূপের পূর্ণ জ্ঞান থাকলে কেবল তখনই মানুষ বাদে অন্যান্য জীবদের সঙ্গেও ভ্রাতা ও সন্তানদের মতো ব্যবহার করতে পারে।

মানুষের মৃত্যুহীন জীবন কামনা একমাত্র চিজ্জগতেই সম্ভব। এই নিবন্ধের সূচনাতেই বলা হয়েছে যে অনন্ত জীবনের কামনা সুপ্ত আধ্যাত্মিক জীবনেরই এক লক্ষণ। মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য সেই অন্তিম লক্ষ্যেই হওয়া উচিত। এখানে উল্লেখিত ভক্তিযোগ পন্থায় প্রত্যেক মানুষের পক্ষে নিজেকে চিন্ময় রাজ্যে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। ভক্তিযোগ এক মহান বিজ্ঞান। জীবনে পরম সিদ্ধি লাভের অনেক বৈজ্ঞানিক এইরকম সাহিত্য ভারতে রচিত হয়েছে।

ভক্তিযোগ মানুষের সনাতন ধর্ম। ধর্মনীতি সহ সকল বিষয়ই যখন জড় বিজ্ঞানের প্রভাবাধীন এমন সময় বর্তমান বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের সনাতন ধর্মনীতিকে দেখা খুবই উৎসাহজনক। এক বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ডক্টর এস, রাধাকৃষ্ণন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে গ্রহণ না করা হলে বর্তমান সভ্যতা ধর্মকে গ্রহণ করবে না। যারা সত্যকে ভালবাসেন, যারা সত্যান্বেষী সানন্দে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছি যে সমগ্র জগতের সনাতন ধর্ম হচ্ছে এই ভক্তিযোগ এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত সমস্ত জীবের জন্যই এই ভক্তিযোগ।

যার আদি এবং অন্ত নেই সেই ধর্মকে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য এইভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। যখন আমরা সনাতন শব্দের কথা বলি তখন আমরা এই অর্থকেই প্রামাণিক বলে স্বীকার করি। সনাতন ধর্ম আদি—অন্তহীন। অন্য যে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মই সীমাবদ্ধ। সনাতন ধর্ম সেই রকম নয়—ভিন্ন রকম। বিজ্ঞানের আলোকে সনাতন ধর্মকে সমস্ত বিশ্বের সব লোকের মুখ্য বৃত্তিরূপেই নয়—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবকুলের মুখ্য বৃত্তিরূপে দেখা সম্ভব হবে। ধর্ম মাত্রই মানব ইতিহাসে এক শুরু আছে কিন্তু সনাতন ধর্মের ঐতিহাসিক কোন শুরু নেই কেননা জীবের সঙ্গে সনাতন ধর্ম অনন্তকাল থেকেই আছে।

যখন এক ব্যক্তি নিজেকে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচয় দেয় এবং জন্মের বিশেষ সময় ও পরিস্থিতির উল্লেখ করে তাকে অ-সনাতন ধর্ম বলে। একজন হিন্দু মুসলমান হতে পারে বা একজন মুসলমান একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান হতে পারে কিন্তু সকল অবস্থায় একটি অপরিবর্তনীয় বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে রয়েছে। সকল পরিস্থিতিতে সে অন্যদের সেবারত আছে। একজন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান সকল অবস্থায় কোনো একজনের সেবক। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর বিশ্বাসই সনাতন ধর্ম নয়। সনাতন ধর্ম হচ্ছে সকল ধর্মের ঐক্য ও সমন্বয় স্থাপনকারী সকল জীবের নিত্য অবস্থা। ভগবদ্‌সেবাই হল সনাতন ধর্ম।

'সনাতন' সম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতায় অনেক স্থানে উল্লেখ আছে। এই প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে আমরা সনাতন ধর্মের তাৎপর্য শিক্ষা লাভ করি। ভগবদ্‌গীতার সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে 'সনাতন' শব্দের উল্লেখ আছে সেখানে ভগবান বলেছেন যে তিনি সবকিছুর সনাতন পরম উৎস এইজন্য তিনিও সনাতন। উপনিষদে সবকিছুর পরম উৎসকে সম্যক্ পূর্ণ বলা হয়েছে। সম্যক্ পূর্ণ, পরম উৎস থেকে উদ্ভূত সকল অংশও সম্যক্ পূর্ণ ঐ সনাতন উৎস থেকে অনেক পূর্ণ অংশ উদ্ভূত হলেও পরিমাণ বা গুণগতভাবে সনাতন পরম উৎসের কোন ক্ষয় হয় না। কারণ, সনাতনের প্রকৃতি হল অবিকার, তার কোন পরিবর্তন হয় না। সময় ও অবস্থার প্রভাবাধীন যা কিছুরই পরিবর্তন হয় তা সনাতন নয়। তাই রূপ বা গুণে যাইহোক যে কোন জিনিসের পরিবর্তন হয় তাকে সনাতন বলে গ্রহণ করা যাবে না। একটি জড় জাগতিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, শত সহস্র বছর ধরে সূর্য কিরণ দিয়ে চলেছেন এবং এটি একটি জড়-জাগতিক সৃষ্টি হলেও সূর্যের রূপ ও কিরণ অপরিবর্তনীয়ই আছে। এইজন্য সবকিছুর পরম মূল উৎস হলেও যার কখনও সৃষ্টি হয়নি, তার রূপ ও গুণের কখন পরিবর্তন হয় না।

ভগবান নিজেকে সব প্রজাতির পিতা বলে দাবি করেছেন অহং *বীজ প্রদ পিতা।* তারা যাইহোক, সকল জীবসত্তাকে ভগবান তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করেছেন। তাই ভগবদ্‌গীতা তাদের সকলের জন্যই। পরমেশ্বর ভগবানের এই সনাতন প্রকৃতির কথা ভগবদ্‌গীতায় আছে। জীব সত্তার সনাতন প্রকৃতি এবং জড় আকাশ থেকে অনেক অনেক দূরে ভগবানের ধামের কথাও সেখানে আছে।

এই জগৎ যে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে পূর্ণ এক দুঃখালয়, ভগবদ্‌গীতায় ভগবান কৃষ্ণ এই তথ্যও আমাদের দিয়েছেন। এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ ব্রহ্মালোকেও এইসব দুঃখ রয়েছে। একমাত্র ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে সম্পূর্ণ দুঃখতাপহীন। সেখানে সূর্য, চন্দ্র বা বৈদ্যুতিক আলোকের কোন প্রয়োজন নেই। এই বৈকুণ্ঠলোকগুলি স্বয়ং আলোকিত, জ্যোতির্ময়। সেখানে জীবন শাশ্বত, জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ। এই লোককেই সনাতন ধাম বলে। ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম, তিনি সনাতন পুরুষ তার ধাম সনাতন ধাম। জীব অবশ্যই তার আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাক, সেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবন উপভোগ করুক্ এটাই স্বাভাবিক, এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। সংসার দাবানলে দগ্ধ হওয়ার জন্য তারা এখানে থাকবে না। এই ভব-সংসারে এমনকি ব্রহ্মালোকেও কোন সুখ নেই। তাই যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তারাই এই জড় জগতের উর্ধ্বলোকে উন্নীত হওয়ার পরিকল্পনা করে। এইসব লোকে ক্ষণস্থায়ী সুবিধা লাভের জন্য তারা দেবতাদের শরণাপন্ন হয়। এইভাবে তারা ধর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে সুবিধা লাভ করে তা ক্ষণস্থায়ী। তবে যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তারা ধর্মের নামে এই সমস্ত অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হন। এইভাবে সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেন। তাই সনাতন ধর্ম হল ভক্তিযোগের পন্থা। আর এই পন্থার মাধ্যমেই সনাতন ভগবান এবং তাঁর সনাতন ধামকে অবগত হওয়া যায়।

চিজ্জগৎ সনাতন ধামে বিরাজমান সনাতন আনন্দ উপভোগের জন্য একমাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমেই সেখানে ফিরে যাওয়া যায়।

যারা সনাতন ধর্মের অনুগামী এখন থেকে ভগবদ্‌গীতার মূল ভাবাদর্শ তারা গ্রহণ করুন। সনাতন ধর্ম গ্রহণে কারো পক্ষে কোন বাধা নেই। এমনকি যে সব ব্যক্তি দিব্য জ্ঞানে তেমন আলোকিত নয় তাঁরাও ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় এবং পরমেশ্বর ভগবান এই শিক্ষা ভগবদ্‌গীতায় দিয়েছেন। মানব জাতিকে এই সুযোগ দেওয়া উচিত। ভারত ভূমিতে ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান দেওয়া হয়েছে; তাই প্রত্যেক ভারতীয়ের কর্তব্য এই ভগবদ্‌গীতার যথার্থ ধর্ম পৃথিবীর অন্য স্থানে প্রচার করা। এই মুহূর্তে জড়বাদের অন্ধকারে মানব জাতি বিভ্রান্ত হয়ে দুঃখ ভোগ করছে তাদের তথাকথিত শিক্ষা পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারে তারা সক্ষম হয়েছে। তাই শীঘ্রই তাদের বিনাশ আসন্ন; তবে সনাতন ধর্ম থেকে তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করবে; এই ধর্ম প্রচারের দ্বারা তারা উপকৃতও হবে।

বিভিন্ন গ্রহলোক

ইদানীং কালে মানুষ যখন চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখন কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন এক পুরানো ফ্যাশান নিয়ে ব্যস্ত বলে জনগণের মনে করা উচিত নয়। যখন সারা বিশ্বের লোক চন্দ্র অভিযানে এত অগ্রগামী আমরা তখন হরিনাম কীর্তন করছি। তবে জনগণ যেন আমাদের সম্বন্ধে ভুল ধারণা না করেন, তারা যেন মনে না করেন আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পিছিয়ে পড়েছি। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই আমরা সমস্ত বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে অতিক্রম করে গেছি। ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে ঊর্ধ্বলোকে যাওয়ার মানুষের এই প্রচেষ্টা নতুন নয়। পত্রিকার শিরোনামায় প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রলোকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ', অথচ সাংবাদিকরা জানে না যে লক্ষ লক্ষ লোক চন্দ্রলোকে গিয়ে ফিরে এসেছেন। এমন নয় মানুষ চন্দ্রলোকে এই প্রথমবার যাচ্ছে। প্রাচীনকাল থেকেই চন্দ্রলোকে যাওয়ার প্রচলন রয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় (৮/১৬) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনঃ আবর্তিনঃ অর্জুন* অর্থাৎ প্রিয় অর্জুন ব্রহ্মলোক নামে সর্বোচ্চলোকে গমন করলেও, তোমাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হবে। তাই গ্রহান্তরে যাত্রা এমন কিছু নতুন নয়। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারীরা এ-সবই জানেন।

কৃষ্ণ যাকে পরম সত্য বলেন, কৃষ্ণভক্ত হওয়ায় আমরা তা স্বীকার করে নিই। বৈদিক শাস্ত্রের মতে গ্রহলোক অসংখ্য। আমরা যে লোকে বসবাস করি, তার নাম ভূর্লোক। এর ঊর্ধ্বে রয়েছে ভুবর্লোক। তার ঊর্ধ্বে স্বর্লোক (চন্দ্র এই গ্রহলোকের অন্তর্গত)। এর উপরে আছে মহর্লোক। তার উপর জনলোক আর তারও উপরে রয়েছে সত্যলোক। সেইরকম অধঃলোকসমূহও রয়েছে। এই রকমভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দটি গ্রহলোক রয়েছে আর সূর্যলোক হচ্ছে গ্রহরাজ। এদের মধ্যে মুখ্য গ্রহলোক। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫২) সূর্যলোকের এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকল গ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"অর্থাৎ আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যার আদেশে অনন্ত তেজস্বী ও তাপদাতা সূর্য তার কক্ষপথে ভ্রমণ করে চলেছেন। সকল গ্রহমণ্ডলের যিনি প্রধান সেই সূর্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের চক্ষু।" বস্তুতঃ সূর্যালোক ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারি না। আমাদের চোখ নিয়ে যতই বড়াই করি না কেন, খালি চোখে আমাদের পাশের বাড়ির প্রতিবেশীকে পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি না। ভগবানকে আমায় দেখাতে পারেন? লোকে আমাদের মুখের সামনে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়। অথচ তাদের দেখার ক্ষমতাই বা কতটুকু? তাদের এই চোখগুলোর মূল্যই বা কতটুকু? ভগবানকে দর্শন করা অত সহজ নয়। 'ভগবৎ দর্শন' তো দূরের কথা, সূর্যালোক ছাড়া আমরা কিছুই দেখতে পারি না। সূর্যের আলোর অভাব হলে, আমরা বস্তুতঃ অন্ধ বলা যায়। রাতে আমরা কিছুই দেখতে পাই না এইজন্য তখন আমরা বিদ্যুতের আলো ব্যবহার করি কেননা সূর্যের আলো তখন পাওয়া যায় না।

মহাকাশে শুধু একটা নয়, লক্ষ লক্ষ, বহু কোটি সূর্য রয়েছে। ব্রহ্মসংহিতায় এসবও উল্লেখ করা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের চিন্ময় দেহের রশ্মিচ্ছটাকে ব্রহ্মজ্যোতি বলা হয়। আর এই ব্রহ্মজ্যোতিতে অসংখ্য গ্রহলোক রয়েছে। ঠিক

পদ উপভোগ করতে পারে, যারা মাধ্যাকর্ষণ, অন্তরীক্ষ ও কাল ইত্যাদির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করেছেন, জড় জাগতিক কর্মে পূর্ণভাবে সিদ্ধি লাভ করেছেন, সেই সিদ্ধযোগীদের আবাস, সিদ্ধলোকে যেতে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের এইসব উচ্চতর লোকে যেতে হলে মন ও বুদ্ধি ত্যাগ করবার প্রয়োজন নেই শুধু স্থূল শরীর ত্যাগ করা দরকার।

মানবসৃষ্ট উপগ্রহ এবং যান্ত্রিক অন্তরীক্ষ যানে মানুষকে মহাকাশের গ্রহলোকে নিয়ে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। এমনকি বহুল বিজ্ঞাপিত চন্দ্রাভিযানে মানুষ সেখানে যেতে পারে না কেননা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি এখানে পৃথিবীর আবহাওয়া থেকে ঐসব উচ্চলোকের আবহাওয়া ভিন্ন রকম। বিভিন্ন প্রতিটি লোকের আবহাওয়া ভিন্ন ভিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ডের কোন বিশেষ লোকে যেতে ইচ্ছুক হলে ঐ লোকের জলবায়ুর ঠিক উপযোগী তার ভৌতিক দেহ থাকা চাই। যেমন, কেউ যদি ভারত থেকে ইউরোপ যেতে চান, যেখানে জলবায়ু ভিন্ন রকম, তাই সেই অনুযায়ী তাকে তার পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। সেই রকম ভাবে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকে যেতে ইচ্ছুক হলে, দেহের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন।

কেউ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বতর লোকে যেতে ইচ্ছুক হলে, সে তার মন, বুদ্ধি ও জড় অহংকার রচিত তার সূক্ষ্ম দেহ রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু মাটি, জল, আগুন আদিতে তৈরি তার স্থূলদেহ পরিত্যাগ করতে হবে। যখন কেউ অপ্রাকৃত চিন্ময়লোকে যান, তখন কিন্তু সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় দেহই পরিবর্তন করা প্রয়োজন কেননা চিন্ময় ধামে পৌঁছতে হবে এক সম্পূর্ণ চিৎ-দেহে। এই পোশাকের পরিবর্তন ইচ্ছা করলে মৃত্যুর সময় স্বতঃই ঘটবে; যদি সারা জীবনব্যাপী এই অভিলাষ সব সময় পোষণ করা হয়। তা হলেই একমাত্র এই অভিলাষ শুধু মৃত্যুর সময় সম্ভব। যেখানে ধনসম্পদ সেখানেই হৃদয়। ভগবদ্ সেবা করবার সময়ই ভগবদ্ ধাম প্রাপ্তির অভিলাষ পোষণ করা হয়। যে

স্থান জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি মুক্ত, সেই বৈকুণ্ঠলোকে সহজে যাত্রার প্রয়াসে যেভাবে প্রস্তুত হওয়া যায়, তার এক সাধারণ অনুশীলনের বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

১। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে ভগবদ্ ধাম-প্রার্থীকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নিতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়ভোগোন্মুখ জড় হওয়ায় তা দ্বারা অপ্রাকৃত চিৎ তত্ত্ব উপলব্ধি আদৌ সম্ভব নয়। এইজন্য সদ্‌গুরুর নির্দেশে শাস্ত্রবিধি সম্মত পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলি চিন্ময় করা চাই।

২। সদ্‌গুরু নির্বাচন করা হলে, শিষ্যকে তাঁর কাছ থেকে অবশ্য দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই দীক্ষা পরমার্থ প্রশিক্ষণের সূচনা করে।

৩। সর্বতোভাবে সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টিবিধানে প্রার্থীকে অবশ্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গীতা, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং উপনিষদাদি বৈদিক শাস্ত্রে পারঙ্গত সম্পূর্ণভাবে আত্মতত্ত্ববিদ্, ভগবদ্ পার্ষদ, সাক্ষাৎ হরি হচ্ছেন সদ্‌গুরু, তিনি ভগবদ্ধাম প্রার্থীকে বৈকুণ্ঠের পথনির্দেশ দিতে পারেন। সদ্‌গুরুকে সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্তুষ্ট করা চাই কেননা সদ্‌গুরুর তুষ্টিবিধানে, তাঁর কৃপাশীর্বাদে ভক্তিমার্গে প্রার্থী অদ্ভুত প্রগতি লাভ করতে পারেন।

৪। বুদ্ধিমান প্রার্থী ভক্তিপথে সকল অনর্থ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে সদ্‌গুরুর কাছে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। খেয়ালখুশী মতো সদ্‌গুরু পথনির্দেশ করেন না, তবে তা আচার্য-মহাজন নির্দিষ্ট পথই নির্দেশ করেন। এইসব অধিকারী আচার্যদের নাম শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে এবং সদ্‌গুরুর নির্দেশে কেবল সেই বিধিনিষেধগুলি পালন করা চাই। সদ্‌গুরু আচার্য নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ কখনও লঙ্ঘন করেন না।

৫। প্রার্থীকে সর্বদা মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে, যারা সিদ্ধি লাভ করেছেন, যারা ঐ বিধি পালন করেছেন। এইগুলিকে

জীবন ব্রত করা চাই। মহাজনদের বাহ্যিক আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয় কিন্তু আন্তরিকভাবে স্থান-কাল বিবেচনা করে তাদের অনুসরণ করা উচিত।

৬। শাস্ত্র-প্রদত্ত আচার্যদের উপদেশাবলী অনুযায়ী প্রার্থীকে অবশ্যই তার অভ্যাস পরিবর্তনে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অর্জুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও কঠোর বৈরাগ্য উভয়ই ত্যাগ করতে অবশ্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৭। তার ভগবদ্ ভজনের অনুকূল পরিবেশে বাস করা উচিত।

৮। কেবল তার ভরণপোষণের জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা সম্পদেই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সহজ ও সরল ভাবে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সম্পদের অধিক সঞ্চয়ের চেষ্টা করা উচিত নয়।

৯। একাদশী তিথিতে তাকে অবশ্য উপবাস করতে হবে।

১০। বটবৃক্ষ, গো, ব্রাহ্মণ এবং ভক্তকে অবশ্য শ্রদ্ধা জানান চাই। ভগবদ্ ভজন মার্গে এই নিয়মগুলি হল প্রাথমিক পদক্ষেপ। ক্রমশ না-সূচক অন্যান্য বিধিগুলিও গ্রহণ করা কর্তব্য।

১১। সেবা অপরাধ ও নামাপরাধ পরিত্যাগ করা চাই।

১২। অভক্তসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে।

১৩। বহু শিষ্য গ্রহণ করা চলবে না। এর অর্থ হল যিনি প্রথম বারটি বিধি সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন তিনিও স্বয়ং একজন গুরু হতে পারেন, ঠিক যেমন সীমিত ছাত্রের ক্লাশে একজন উপদেশক হতে পারেন।

১৪। শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি নিজেকে একজন বিরাট পণ্ডিত রূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করবেন না। অন্যান্য শাস্ত্রের অতিরিক্ত কেতাবী জ্ঞানের দরকার নেই, তবে প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীয় তত্ত্বজ্ঞান তাঁর অবশ্য থাকা চাই।

১৫। জাগতিক লাভ-ক্ষতির কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও উপরের ১৪ দফা নিয়ম-বিধি প্রতিনিয়ত ও সাফল্যের সঙ্গে অনুশীলনের ফলে প্রার্থী তার মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারবেন।

১৬। পরবর্তী পর্যায়ে প্রার্থীকে কোন অবস্থারই শোক-মোহে অভিভূত হলে চলবে না।

১৭। তিনি যেমন অন্যের ধর্মীয় ও উপাসনাগত মনোভাবের নিন্দা করবেন না, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান ও ভগবদ্ভক্তেরও নিন্দা করবেন না।

১৮। ভগবান বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা তিনি কখনও সহ্য করবেন না।

১৯। নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ক আচরণ সম্পর্কে আলোচনায় তার অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। অন্যদের পারিবারিক ব্যাপারে অনর্থক বিষয় সম্পর্কে তার মনোনিবেশ করা উচিত নয়।

২০। জীবমাত্রকেই দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ বা উদ্বেগ দেওয়া উচিত নয়।

২০টি নিয়মবিধির প্রথম তিনটি ইতিবাচক বিধি ঐকান্তিক প্রার্থীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় ও একান্ত প্রয়োজন। ঐকান্তিক প্রার্থীর আরও ৪৪টি বিধি পালনীয় তবে চৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচটি বিধিকে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে নির্বাচন করেছেন। পরিণত জীবনের বর্তমান অবস্থার জন্য এই বিধি কটি নির্বাচিত হয়েছে।

১। ভক্তসঙ্গ করা উচিত। ভক্তদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, তাদের পারমার্থিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, প্রসাদ বিতরণ ও গ্রহণ, তাদের কিছু দান করা এবং তাদের দান গ্রহণ করা।

২। সকল অবস্থায় পবিত্র হরিনাম কীর্তন করা। এই নাম কীর্তন ভগবদ্ উপলব্ধির এক সহজ পন্থা, যার জন্য কোনো মূল্য দিতে হয় না। যে কোন সময় অসংখ্য ভগবন্নামের যে কোন একটি কীর্তন করা যায়। নামাপরাধ পরিত্যাগে সচেষ্ট হওয়া উচিত। দিব্য ভগবন্নাম

আত্মপ্রকাশ করেন। কৃষ্ণ ও সদ্‌গুরু উভয়ই নিষ্কপট ভক্তকে সাহায্য করেন। সদ্‌গুরু হচ্ছেন সকলের হৃদয়স্থ অন্তর্যামীর বহিঃপ্রকাশ। ভগবদ্‌ অনুভূতিতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী ব্যক্তিকে পরমাত্মা সদ্‌গুরুর সন্ধান দিয়ে তক্ষুণি সাহায্য করেন। এইভাবে পরমার্থ অনুশীলনে আগ্রহী ব্যক্তিকে অন্তর ও বাহির থেকে সাহায্য করা হয়।

ভগবদ্‌ পুরাণের শিক্ষা অনুযায়ী পরম সত্য তিন রূপে উপলব্ধ হয়। প্রথমে নির্বিশেষ ব্রহ্ম রূপে, তারপর পরব্রহ্ম বা অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে। অণু'র নিউট্রনকে পরমাত্মার প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে, এই নিউট্রনও অণুতে প্রবেশ করে। ব্রহ্মসংহিতায় এই তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু চরমে তাঁকে সমগ্র ঐশ্বর্য, বল, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যে পূর্ণ অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট সর্বাকর্ষক পরম পুরুষ (কৃষ্ণ) রূপে উপলব্ধি করা। মনুষ্যরূপে অবতরণ করে, ভগবান শ্রীরাম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ছয়টি শক্তি পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেছিলেন। এক শ্রেণীর মানুষই শুধু, যারা অনন্য কৃষ্ণভক্ত কেবল তারাই প্রামাণিক শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণকে চিনতে পারেন, আর জড়া প্রকৃতির প্রভাবে অন্যরা বিভ্রান্ত হয়। অতএব যাঁর সমান কেউ নেই, যার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই, সেই অদ্বিতীয় পুরুষই হচ্ছেন পরম সত্য। ব্রহ্মজ্যোতি হল তাঁর দিব্য দেহের রশ্মিচ্ছটা যেমন সূর্যরশ্মি হল সূর্যের আলোকচ্ছটা।

বিষ্ণুপুরাণে জড়া শক্তিকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা হয়েছে, আর তা সকাম কর্ম, ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। জীবাত্মা যদিও ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য মায়া বিমোহিত হওয়ার প্রবণতা বশত জড়া প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হতে পারে, তবু সে পরা প্রকৃতি বা চিৎ শক্তির অন্তর্গত। এই অর্থে জীবাত্মা উৎকৃষ্ট তটস্থা শক্তি, অথচ জড় পদার্থ নিকৃষ্ট শক্তি। শ্রেয় চিৎশক্তি বা অপ্রাকৃত শক্তির সান্নিধ্য ছাড়া জড়ের বিকাশ হয় না। এই শ্রেয় পরা প্রকৃতি সোজাসুজি চিন্ময় ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য

অংশ। সাধারণ লোকের কাছে জীবাত্মা প্রদর্শিত এই পরা প্রকৃতির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে দুরূহ, খুব জটিল। এইজন্যই জনগণের কাছে পরা প্রকৃতি আশ্চর্যজনক, চমকপ্রদ। কখনও কখনও জনগণ অপূর্ণ ইন্দ্রিয় দ্বারা আংশিকভাবে এই শক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, আবার কখন এই প্রকৃতিকে বুঝতে সম্পূর্ণভাবে জনগণ ব্যর্থ হয়। এই জন্য আচার্যশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ বা গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারায় তার প্রতিনিধি, কৃষ্ণভক্তের কাছ থেকে শ্রবণ করা সবচেয়ে ভাল।

ভগবদ্‌ উপলব্ধির জন্যই এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন। বাইরে কৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরু এবং অন্তরে পরমাত্মা কৃষ্ণ জীবকে সাহায্য করেন। সেই রকম পরিচালনার সুযোগ লাভ করে জীব তার জীবন সফল করতে পারে। এই হরেকৃষ্ণ আন্দোলনকে বুঝবার জন্য আমরা প্রামাণিক শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করি। আমরা 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ', 'শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত', 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' ও 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' প্রকাশ করেছি। প্রতি মাসে আমাদের পত্রিকা 'ভগবৎ দর্শন' অনেক ভাষায় আমরা প্রকাশ করছি। জন্ম-মৃত্যুময় সংসারকূপ থেকে মানব সমাজকে উদ্ধার করাই হল আমাদের জীবনব্রত।

কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। 'ভগবৎ দর্শন' পত্রিকায় 'জড় জগতের ঊর্ধ্বে' শিরোনামায় আমরা একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। ভগবদ্‌গীতার জ্ঞান অনুযায়ী এই জগতের ঊর্ধ্বে অপর একটি জগতের বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্‌গীতা একটি অতীব জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থ আর আমেরিকায় এর অনেক সংস্করণ রয়েছে; আবার ভারতেও বহু আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে বহু নির্বোধ, মূর্খ পাশ্চাত্য দেশে ভগবদ্‌গীতা শিক্ষা দিতে আসে। নির্বোধ নামের যোগ্য এরা ধাপ্পাবাজ কেননা এরা গীতার যথাযথ জ্ঞান প্রদান করে না। আমাদের প্রকাশিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ'-তে কিন্তু পরা প্রকৃতির প্রামাণিক বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

এই সৃষ্টিকে বলা হয় 'প্রকৃতি' তবে উৎকৃষ্ট অন্য একটি প্রকৃতিও আছে। এই জড়া সৃষ্টি হচ্ছে নিকৃষ্ট প্রকৃতি। কিন্তু এই ব্যক্ত জড়া সৃষ্টির অতীত, অব্যক্ত আর এক প্রকৃতি আছে, যাকে সনাতন বলে, যা শাশ্বত। এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে ব্যক্ত সবকিছুই এখানে অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল আমাদের দেহ। কারো ৩০ বছর বয়স হলে, অত বছর পূর্বে তার দেহের সৃষ্টি হয়েছে, আরও অত বছরে ঐ দেহটির নাশ হবে। এটাই হল প্রকৃতির বস্তুতঃ একটি নিয়ম। ঠিক যেমন সমুদ্রে ঢেউ উঠে। আবার তা বিলীন হয়ে যায়, এর সৃষ্টি হল আবার তা বিলুপ্ত হল। জড়বাদীরা শুধু এই অনিত্য জীবন নিয়েই ব্যস্ত, যা মুহূর্তের মধ্যে বিনষ্ট হতে পারে। তার উপর, দেহ বিনষ্ট হলে, এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড, এই বিশাল জড় সৃষ্টি বিলীন হবে আর আমরা ভাগ্যবান বা দুর্ভাগা যা-ই হই না কেন, এই পৃথিবীর বা অন্য গ্রহের সব কিছুই বিনষ্ট হবে। তাহলে যেখানে সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে, সেই গ্রহ যাত্রার প্রচেষ্টায় আমরা সময় নষ্ট করছি কেন? বরং চিৎ জগৎ কৃষ্ণলোক যাত্রায় আমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিত। এটাই হল চিৎতত্ত্ব; এই চিন্ময় বিজ্ঞানই আমাদের অনুধাবন করতে হবে। আর এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে, এই বাণী সমগ্র বিশ্বে আমাদের প্রচার করতে হবে। প্রত্যেকেই অজ্ঞানের অন্ধকারে রয়েছে। যথাযথ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, তারা সবসময়ই বড়াই করে চলে। দীর্ঘ ১০ বছরের প্রচেষ্টার পর চাঁদে গিয়ে একখণ্ড পাথর নিয়ে ফিরে আসাটা কোন জ্ঞানের প্রগতি সূচনা করে না। মহাকাশচারীরা গর্বভরে বলে 'আহা! আমি লক্ষ্যে পৌঁছেছি। অথচ তারা কি পেল? এমনকি ঐ অন্য লোকে বসবাস করতে সক্ষম হলেও, তা দীর্ঘ সময় নয়। অবশেষে সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে।

এমন গ্রহলোকের অন্বেষণ করুন, যেখানে গেলে কখনও আর ফিরে আসতে হবে না। যেখানে জীবন অনন্ত, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে

নৃত্য করা যায়। এই হল কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের তাৎপর্য। এই আন্দোলনকে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করুন কেননা কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করে, তাঁর সঙ্গে অনন্তকাল ধরে নৃত্য করার এক সুযোগ প্রদান করে। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে এই জড়া প্রকৃতি হল ভগবানের সমগ্র সৃষ্টির মাত্র এক চতুর্থাংশ, তাঁর সৃষ্টির তিন চতুর্থাংশ হল চিৎ জগৎ। ভগবদ্গীতা থেকে আমরা এই তথ্য লাভ করি। ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, এই জড়া প্রকৃতি হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টির এক নগণ্য অংশ মাত্র। যতদূর দৃষ্টি যায় যদি আমরা উপরে আকাশের দিকে তাকাই, আমাদের দৃষ্টি তবু কেবল একটি ব্রহ্মাণ্ডেই নিবদ্ধ থাকবে। যাকে সৃষ্টি, যাকে জড়া প্রকৃতি বলে তার মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। তার ঊর্ধ্বে আছে চিদাকাশ, বা পরব্যোম, যা ভগবদ্গীতায়ও উল্লেখ করা হয়েছে। গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন, জড়া প্রকৃতির অতীত অন্য এক প্রকৃতি আছে সেই প্রকৃতি সনাতন, সেই প্রকৃতি শাশ্বত। এই প্রকৃতির আদির কোন ইতিহাস নেই আর এর অন্তও নেই। যার আদি ও অন্ত নেই তাকে সনাতন বলে উল্লেখ করে। তাই এই বৈদিক সংস্কৃতির নাম সনাতন ধর্ম। কেননা কেউ এই সংস্কৃতির সূচনার ইতিহাস খুঁজে পায় না। খ্রিস্টান ধর্মের দু'হাজার বছরের ইতিহাস আছে, আর মুসলিম ধর্মেরও একটি ইতিহাস আছে, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃতির আদি অন্বেষণ করলে, তা কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। তাই এই সংস্কৃতিকে সনাতন ধর্ম বলা হয়।

আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি যে ভগবান এই জড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন আর এর অর্থ হল ভগবান সৃষ্টির পূর্বেই ছিলেন। এই 'সৃষ্টি করেছেন' কথাটা দ্বারাই অনুধাবন করা যায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেই ভগবান বিরাজমান ছিলেন। তাই ভগবান সৃষ্টির অধীন তত্ত্ব নন্। সৃষ্টির অধীনতত্ত্ব হলে কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্তা হলেন? তাহলে তিনি

জড়াপ্রকৃতি বা সৃষ্টির কোন এক বিষয় হতেন। ভগবান কিন্তু সৃষ্টির কোন অধীন তত্ত্ব নন্। ভগবান সৃষ্টিকর্তা আর তাই তিনি সনাতন, তিনি শাশ্বত, তিনি অনন্ত।

পরব্যোম নামে এক চিদাকাশ আছে সেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক আছে যেমন অসংখ্য বৈকুণ্ঠবাসী আছেন। যারা ঐ চিন্ময়লোকে বসবাসের যোগ্য নয়, তাদের এই জড় জগতে প্রেরণ করা হয়। স্বেচ্ছায় আমরা এই জড় দেহ ধারণ করেছি অথচ আমরা বস্তুতঃ চিন্ময় জীবাত্মা এই জড় দেহ ধারণ করা আমাদের উচিত হয় নি। কখন এবং কবে আমরা এই জড় দেহ ধারণ করেছিলাম তার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। কখন প্রথম মায়াবদ্ধ জীবাত্মা তা করেছিল তার ইতিহাস কেউ খুঁজে বের করতে পারে না। ৮৪ লক্ষ জীবদেহ রয়েছে, জলে ৯ লক্ষ রকমের প্রজাতি আছে, ২০ লক্ষ রকমের লতাদি, দুঃখের বিষয় এই যে, এই বৈদিক শিক্ষা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করে না। অথচ এসব বাস্তব সত্য। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণা করতে দেওয়া হোক্ এই বৈদিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে। ডারউইনের জৈব পদার্থের বিবর্তনবাদ অবশ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তবে ভাগবত পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে কিভাবে বিভিন্ন প্রজাতির জীবাত্মার বিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি কোন এক নতুন ধারণা নয়, অথচ শিক্ষকরা ডারউইনবাদের কেবল গুরুত্ব আরোপ করছে, যদিও আমাদের বৈদিক সাহিত্যে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে অশেষ তথ্য রয়েছে।

সৃষ্টির বহু ব্রহ্মাণ্ডের জীবকুলের মধ্যে আমরা কেবল এক সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। এ জগতের জীবের জড় দেহ নিন্দনীয়। যেমন, কারাগৃহের কয়েদীরা সরকারের কাছে নিন্দনীয়, কিন্তু সমগ্র জনগণের মধ্যে সংখ্যায় তারা সামান্য অংশ মাত্র। এমন নয় যে সমগ্র জনসাধারণই কারাগৃহে যায়; কেবল সরকারী আইন অমান্যকারীরা কিছু

কয়েদী হয়। সেইরকম এই জড় জগতের মায়াবদ্ধ জীব হচ্ছে ভগবানে সৃষ্টি সমগ্র জীবকুলের কেবল এক ভগ্নাংশ মাত্র আর ভগবানকে অমান্য করায়, কৃষ্ণের আদেশ পালন না করায় তাদের সকলকে এই জড় জগতে বাস করতে হচ্ছে। জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ব্যক্তির অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত "এই মায়াবদ্ধ দশায় আমি পতিত হলাম কেন?—আমি তো সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই না।"

দৈহিক ও মানসিক ক্লেশকে নিয়ে তিন রকম ক্লেশ আছে। আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আমার ঘরের সামনে একটি লোক জবাই করার জন্য কিছু পশু ও পাখী রেখেছিল। আমার শিষ্যদের আমি এই দৃষ্টান্ত দিই 'পশুগুলো এখানে দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি তাদের বল 'ওহে, বাছা পশুর দল, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? দৌড়ে পালিয়ে যাও! তোমাদের জবাই করার জন্য নিয়ে যাবে কসাইখানায়।' তারা কিন্তু পালিয়ে যেতে পারে না। তাদের সেই বুদ্ধি নেই। অজ্ঞানে, নিরাপত্তাহীনভাবে ক্লেশ ভোগ করা পশুর জীবন। যে অনুধাবন করতে পারে না যে সে ক্লেশযন্ত্রণা ভোগ করছে, অথচ মনে করছে যে সে বেশ ভালোই আছে, সেটা হল পাশবিক চেতনা, মানবচেতনা নয়। ত্রিতাপ যন্ত্রণা সম্বন্ধে প্রকৃত মানুষের সচেতন হওয়া উচিত। জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি যন্ত্রণা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই, আর এই সব ক্লেশ তাপ থেকে উদ্ধারের পথ অনুসন্ধান করা চাই। এইটি হওয়া উচিত আমাদের গবেষণার বিষয়।

আমাদের জন্মের শুরু থেকেই আমরা যন্ত্রণা ভোগ করছি। মাতৃগর্ভে একটি শিশুরূপে মানুষ এক নির্দিষ্ট বায়ুপূর্ণ থলেতে ন'মাস অবস্থান করে। সে ঐ অবস্থায় ওখানে নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না, সেখানে কীটরা তাকে কামড়ায়, অথচ সে প্রতিবাদ করতে পারে না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও সে ক্লেশ ভোগ করে চলে। তার মা নিঃসন্দেহে তার যথেষ্ট যত্ন নেয়, তবু শিশুটি কাঁদে কেননা তাকে

যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পোকার কামড় বা ক্ষুধায় সে কাঁদে আর তার মা জানে না কি করে তাকে শান্ত করা যায়। মাতৃগর্ভ থেকেই তার যন্ত্রণা ভোগের শুরু। জন্মের পর যে-ই সে বড় হতে থাকে, তখন আবার ক্লেশতাপ ভোগ করতে হয়। সে যেতে না চাইলেও, স্কুলে যেতে সে বাধ্য হয়। সে পড়তে চায় না, অথচ শিক্ষক তাকে পাঠ দান করে। যদি আমরা জীবনকে বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের জীবন দুঃখযন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। কেন তাহলে আমরা এই ভবসংসারে আসছি? মায়াবদ্ধ জীব তেমন প্রখর বুদ্ধিমান নয়। আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা চাই 'আমি দুঃখক্লেশ ভোগ করছি কেন? এই তাপক্লেশ থেকে উদ্ধারের পথ থাকলে, সেই সুযোগ আমাকে নিতে হবে।

আমরা চিরন্তন পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। কিন্তু এখন আমরা কোন না কোন ভাবে জড় কলুষতায় পূর্ণ। অতএব এখন আমাদের এমন এক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা আবার বৈকুণ্ঠ, চিদ্ জগতে ফিরে যেতে পারি। সেই মিলনের পদ্ধতিকে 'যোগ' বলা হয়। যোগ শব্দের যথার্থ অর্থ হল সংযুক্ত। এই মুহূর্তে আমরা ভগবান বা পরমব্রহ্মের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন। কিন্তু যখন আমরা সংযোগ করব,—ভগবৎসম্বন্ধ যুক্ত হব, তখন আমাদের মানবজীবন সফল হবে। এই পূর্ণতা, সেই সিদ্ধদশায় পৌছবার জন্য আমাদের জীবদ্দশায়ই অনুশীলন করতে হবে। আর যখন আমরা এই জড়দেহ ত্যাগ করে, সেই সফলতা বা পূর্ণতা অর্জন করতে চাই, তখন মৃত্যুর সময় প্রস্তুত হতেই হবে। যেমন ছাত্ররা ২ থেকে ৫ বছর ধরে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় আর তাদের শিক্ষার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়। তাতে উত্তীর্ণ হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করে। সেইরকম আমাদের জীবনে মৃত্যুর সময়ের পরীক্ষার জন্য আমরা যদি প্রস্তুত হই ও তাতে উত্তীর্ণ হই তাহলে আমরা চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হই।

মৃত্যুর সময় সবকিছুর পরীক্ষা হয়। বাংলায় একটা প্রবাদে বলা হয় 'সাধন কর, ভজন কর, মরতে জানলে হয়।' যখন আমরা মরতে যাচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের কি করা উচিত তা ভগবদ্‌গীতায় বর্ণনা করা আছে। ধ্যান যোগীদের জন্য ভগবদ্‌গীতায় (৮/১১-১২) শ্রীকৃষ্ণ নীচের শ্লোকগুলি বলেছেন—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥

"বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।"

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥

"ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।"

এখন চোখ জড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে ব্যস্ত, চোখকে সেই ভোগ থেকে নিবৃত্ত করে, আমাদের অন্তরের সৌন্দর্য দর্শনে নিযুক্ত করতে হবে,—যাকে প্রত্যাহার বলে। সেই রকম অন্তর থেকে ওঁ শব্দ ব্রহ্ম শ্রবণ করা চাই।

ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম
ব্যহরন্ মাম্ অনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং
স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

"যোগ অনুশীলনে নিরত হয়ে পবিত্র অক্ষরব্রহ্ম ওঁ কার উচ্চারণ করে, পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে কেউ দেহ ত্যাগ করলে, সে নিশ্চয় চিন্ময়লোক, বৈকুণ্ঠগতি লাভ করবেন।" (গীতা ৮/১৩) এইভাবে সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করে মনকে ভগবান বিষ্ণুর শ্রীমূর্তিতে আবিষ্ট করতে হবে। একেই যোগসিদ্ধ অবস্থা বলে। মন অতীব চঞ্চল। তাই মনকে হৃদয়ে স্থির করতে হবে। তা করা হলে প্রাণবায়ুকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পাঠাতে হবে, তখন যোগ অনুশীলনে পূর্ণতা লাভ হবে।

সিদ্ধযোগী তখন কোন্ গ্রহলোকে যাবে, তা নির্ণয় করে। জড় জগতে অসংখ্য গ্রহলোক আছে আর এইসব গ্রহলোকের অতীত হচ্ছে চিন্ময়, বৈকুণ্ঠলোক। বৈদিক শাস্ত্রে যোগীরা এইসব তথ্য পেয়েছেন। যেমন, আমেরিকায় আসবার আগে বই থেকে আমি এই দেশের বিবরণ পড়েছিলাম। সেই রকম উচ্চলোক ও চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোকের বিবরণ বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যোগী এসব জানেন, তাই তিনি ইচ্ছামতো যে কোন গ্রহলোকে স্বয়ং যেতে পারেন। তবে এ কাজে তার কোন মহাকাশযানের প্রয়োজন হয় না।

জড়বিজ্ঞানীরা বহু বছর ব্যাপী চেষ্টা করে চলেছেন, আর তারা একশ বা হাজার বছরের বেশী চেষ্টা করে যাবেন তবে তারা কোন গ্রহলোকেই পৌছতে পারবেন না। হয়তো বৈজ্ঞানিক পন্থায় দু-একজন কোন গ্রহলোকে পৌছতে পারেন। কিন্তু সেটা কোন সাধারণ পন্থা নয়। অন্য লোক প্রাপ্তির স্বীকৃত সাধারণ পন্থা হল যোগ বা জ্ঞান মার্গ অনুশীলন। তবে ভক্তিযোগ, ভক্তিমার্গ জড় জগতের কোন গ্রহলোক প্রাপ্তির জন্য নয়। যারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা বা ভক্তিযোগের অনুশীলনে নিযুক্ত তারা এই জগতের কোন গ্রহলোকে যেতে আগ্রহশীল নয় কেননা তারা জানেন, যে গ্রহলোকই তিনি প্রাপ্ত হোন্, সেখানেও তিনি ভবসংসারের চারটি অবস্থা দেখতে পারবেন। কোন কোন গ্রহলোকে জীবের আয়ুষ্কাল এই জগতের জীবের চেয়ে

অনেক দীর্ঘ হলেও সেখানে মৃত্যুও আছে। যারা কৃষ্ণভাবনাময় তারা কিন্তু জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিময় ভবসংসার অতিক্রম করে। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন, পারমার্থিক জীবন মানে হচ্ছে এই সংসারক্লেশ থেকে মুক্তি। ভগবদ্গীতার (২/২০) শুরুতেই তা প্রতিপন্ন হয়েছে—*ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে।* আমরা জীবাত্মা, আর তাই আমরা শাশ্বত, সনাতন, তাহলে আমরা জন্ম, মৃত্যু চক্রের অধীন হব কেন? এই ভাবনা উন্নত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। যারা কৃষ্ণভাবনাময় তারা খুবই বুদ্ধিমান কারণ তারা জড় জগতের কোন গ্রহলোক প্রাপ্তিতেই আগ্রহশীল নয়, সেখানে জীবের আয়ুষ্কাল সুদীর্ঘ হলেও। বরং, তারা ভগবানের মতো এক দেহ লাভ করতে চান। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১) ভগবৎ দেহ সচ্চিদানন্দময়। সৎ মানে শাশ্বত, সনাতন, আর চিৎ মানে জ্ঞানময়। 'আনন্দ' হচ্ছে আনন্দপূর্ণ। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন মানেই হল এই সংসার ক্লেশ, ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি। এই জন্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জড় জগতের কোন গ্রহলোক প্রাপ্তিতে প্রয়াসী হন না। আজকাল মানুষ চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে আর চন্দ্রলোকে যাওয়া খুবই কঠিন হলেও, যদি সেখানে আমরা প্রবেশ করতে পারি। আমাদের আয়ু অনেক বর্ধিত হবে। অবশ্য এই দেহের জীবনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এই দেহে যদি আমাদের চন্দ্রলোকে প্রবেশ করতে হয়, সেই মুহূর্তেই আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

কোন গ্রহলোকে প্রবেশ করলে, সেই গ্রহলোকের উপযুক্ত দেহ থাকা চাই। প্রত্যেক গ্রহলোকে বসবাসকারীর সেই গ্রহের উপযুক্ত দেহ রয়েছে। যেমন, আমরা এই দেহে জলে প্রবেশ করতে পারি তবে আমরা সেখানে বসবাস করতে পারি না। সেখানে হয়তো আমরা ১৫ কি ১৬ ঘণ্টা থাকতে পারি, বা ২৪ ঘণ্টাও থাকতে পারি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, অথচ জলে সারাটা জীবন যাপনের উপযুক্ত শরীর জল-

জীবদের রয়েছে। সেই রকম কেউ একটা মাছকে জল থেকে তুলে জমিতে রাখলে অচিরেই মাছটির মৃত্যু হবে। এমনকি এই গ্রহের বিভিন্ন জায়গায় জীবনযাপনের উপযুক্ত বিভিন্ন রকম দেহ রয়েছে সেইরকম অন্য গ্রহলোকে প্রবেশ করবার জন্য এক উপযুক্ত দেহ লাভের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

কোন জীবাত্মা যৌগিক পন্থায় চন্দ্রলোকে গমন করে সে সুদীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়। আমাদের ৬ মাসে ঊর্ধ্বলোকের একদিন হয়। এইভাবে চন্দ্রলোকবাসী ১০ হাজার বছর বাঁচে। বৈদিক শাস্ত্রের এই বিবরণ। এইভাবে একজন সুদীর্ঘ জীবন লাভ করলেও, তবু মৃত্যু সেখানে রয়েছে। দশ, বিশ বা এমনকি লক্ষ লক্ষ বছর পরও মৃত্যু আসে।

বস্তুতঃ আমরা অবিনশ্বর। ভগবদ্গীতায় (২/২০) তা সমর্থন পাওয়া যায় ঃ *ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*। আমরা চিন্ময় আত্মা, আর তাই আমরা শাশ্বত। তাহলে আমরা জন্ম মৃত্যু চক্রের অধীন হব কেন? এইভাবে চিন্তা করা বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ। কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী খুবই বুদ্ধিমান কেননা সুদীর্ঘ জীবনকাল সত্ত্বেও, মৃত্যুময় ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তিতে তারা আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে, তারা ভগবানের মতো দেহ লাভ করতে চায়। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ* (ব্রহ্মসংহিতা ৫/১)। ভগবদ্দেহ সনাতন, চিন্ময় ও আনন্দঘন। সৎ মানে সনাতন। চিৎ মানে চিন্ময়। আনন্দ হচ্ছে আনন্দঘন। আমাদের বই 'রসরাজ কৃষ্ণ' এ উল্লেখ করা হয়েছে যদি আমরা চিজ্জগৎ কৃষ্ণলোক বা অন্য কোন বৈকুণ্ঠলোকে যাই তাহলে আমরা ভগবানের মতো এক সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সনাতন, চিন্ময় ও আনন্দঘন দেহ লাভ করব। তাই যারা জড় জগতের অপেক্ষাকৃত উন্নতলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তাদের চেয়ে যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার প্রয়াসী তাদের লক্ষ্য ভিন্ন। ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন *'মূর্ধন্যাধ্যাৎ মন প্রাণম্ আস্থিতো যোগধারণম্'* অর্থাৎ চিজ্জগতে যাওয়া হল যোগসাধনার সিদ্ধি। (গীতা ৮/১২)

জীবাত্মা হল দেহস্থ এক অণু কণা মাত্র। আমরা এই চিৎকণকে দেখতে পাই না। যোগ অনুশীলনকারী আত্মাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠায়। জীবিতাবস্থায় এই অনুশীলন চলে, যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে নিজেকে স্থাপন করে কেউ, তখন তার মধ্য দিয়ে বের হতে পারে, তখন সে সিদ্ধিলাভ করে। তখন তিনি তাঁর ইচ্ছামতো যে কোন ঊর্ধ্বলোকে যেতে পারেন এইটি হচ্ছে যোগীর সাফল্য।

যোগী যদি চন্দ্রলোক দেখতে উৎসুক হন, তিনি বলতে পারেন 'আহা! দেখা যাক্ চন্দ্রলোক কেমন। তখন আমি ঊর্ধ্বলোকসমূহে যাব, ঠিক যেমন দেশ ভ্রমণকারীরা ইউরোপ, ক্যালিফোর্ণিয়া, কানাডা বা অন্যান্য দেশে যায়। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে বহু গ্রহলোকে যাওয়া যায়, তবে যেখানেই সে যাক্ ভিসা (প্রবেশাধিকারপত্র) ও শুল্ক ব্যবস্থা দেখবে সে। অন্য লোকে যেতে হলে যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া চাই।

অনিত্য গ্রহলোকের জীবনকাল সুদীর্ঘ হলেও, কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিরা সেখানে যেতে আগ্রহী নন। মৃত্যুর সময় যোগী শব্দব্রহ্ম ওঁ কার উচ্চারণ করতে পারে আর সেই সময় *মাম্ অনুস্মর*, কৃষ্ণ, বিষ্ণুকে স্মরণ করে, তিনি পরম গতি লাভ করেন। যোগ সাধনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মনকে বিষ্ণুতে কেন্দ্রীভূত করা। নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করে যে তারা ভগবান বা বিষ্ণুর রূপ দর্শন করে কিন্তু সবিশেষবাদীরা তা কল্পনা করে না, বস্তুতঃ তারা পরমেশ্বর ভগবানের রূপ দর্শন করে। কল্পনার মাধ্যমে মনকে কেন্দ্রীভূত করা হোক্, বা বস্তুতঃ তাকে দর্শন করুক্, যে কোন ক্ষেত্রেই—বিষ্ণুর রূপে মনকে কেন্দ্রীভূত করা চাই। 'মাম্' এর অর্থ 'পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুতে'। ভগবান বিষ্ণুতে মন কেন্দ্রীভূত করে দেহত্যাগ করলে, দেহান্তে তিনি ভগবদ্ধাম

বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করে। যারা বাস্তবিকই যোগী তারা অন্য কোন লোকে প্রবেশ করার ইচ্ছা করেন না, কেননা তারা জানেন অন্যান্য অনিত্য গ্রহলোকে জীবনও অনিত্য আর তাই সেখানে যেতে তারা আগ্রহী নয়। এটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

ভগবদ্গীতা অনুযায়ী যারা অনিত্য সুখ, জীবন ও সুযোগ সুবিধায় তৃপ্ত, তারা বুদ্ধিমান নয়। *অন্তবৎ তু ফলম্ তেষাম্ তদ্ ভবতি অল্পমেধসাম্* অর্থাৎ "অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনিত্য বস্তুতে আগ্রহশীল।" এটা হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী। আমি অবিনাশী, তাহলে আমি কেন নশ্বর অনিত্য বস্তুতে আগ্রহী হব? কে অনিত্য অস্তিত্ব চায়?—কেউই তা চায় না। আমরা কোন আবাসনে থাকলে, মালিক গৃহত্যাগ করতে বললে, আমরা দুঃখ পাই তবে আমরা আরো ভাল আবাসনে গেলে, দুঃখিত হই না। এই হচ্ছে আমাদের প্রবণতা। আমরা মরতে চাই না কারণ আমরা অবিনশ্বর, আমরা শাশ্বত।

ভৌতিক পরিবেশ আমাদের অবিনশ্বরতা কেড়ে নিচ্ছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে 'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্যদেব আমাদের জীবনকাল ক্ষয় করে চলেছেন। প্রতিদিন আমাদের আয়ুষ্কাল হ্রাস পাচ্ছে। সকালে ৫.৩০টায় সূর্যোদয় হলে, সন্ধ্যায় ৫.৩০টায় ১২ ঘণ্টা আমাদের জীবনকাল থেকে চলে গেছে। এই সময়টা আমরা জীবনে আর কখনও ফিরে পাব না। আমরা যদি বিজ্ঞানীকে বলি 'আপনাকে ১২ কোটি টাকা দেব, দয়া করে আমাকে ঐ ১২ ঘণ্টা ফিরিয়ে দিন', তিনি বলবেন 'না, তা দেওয়া সম্ভব নয়।' বিজ্ঞানী তা পারেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে 'উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সূর্য আমাদের জীবনকাল ক্ষয় করে চলেছে।'

অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সময়কে 'কাল' বলা হয়। এখন যা বর্তমান, আগামীকাল তা-ই হবে অতীত। এখন যা ভবিষ্যৎ, আগামীকাল তা-ই হবে বর্তমান। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

হল দেহেরই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। আমরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের নয়। আমরা সনাতন, আমরা শাশ্বত, অবিনশ্বর। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও আত্মরক্ষার পাশবিক প্রবণতা—মানবজাতির উন্নত চেতনাকে ব্যবহারের জন্য নয়, তবে শাশ্বত জীবন লাভের সহায়ক মূল্যবান পথের অন্বেষণের উদ্দেশ্যে। বলা হয় যে আমাদের জীবনের প্রতিটি মিনিট, প্রতি ঘণ্টা, প্রতিটি দিন কালচক্রের করাল গ্রাসে তা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা উত্তমশ্লোক, হরিকথামৃত আস্বাদনে নিযুক্ত হলে সেই সময়গুলি অক্ষয় হয়ে যায়। মন্দিরে কৃষ্ণানুশীলনে রত ভক্তের জীবন অক্ষয়। কৃষ্ণানুশীলন এক শাশ্বত, অবিনশ্বর সম্পদ; এই সম্পদের ক্ষয় নেই, এই সম্পদ অক্ষয়। জড় শরীর সম্বন্ধে বলা যায়, এই দৈহিক জীবন বিনষ্ট হয়। তবে দেহ রক্ষার চেষ্টা করলেও, কেউ তা পারে না। কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনে আমরা যে পরাবিদ্যা লাভ করি কালের প্রভাবে তার বিনাশ হয় না—তা এক অক্ষয়, অবিনশ্বর, শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন খুবই সহজ। শরীরের উপর কালের প্রভাবের মতো হরিনাম কীর্তনে কাল অতিবাহিত হয় না। ৫০ বছর আগে আমি একজন যুবক ছিলাম; সেই সময় চলে গেছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। আমি আমার গুরুদেবের কাছে যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছি তা কিন্তু ক্ষয় হবে না, বিনষ্ট হবে না—আমার সঙ্গে থেকে যাবে। এমনকি আমি দেহত্যাগ করলেও, তারপর ঐ জ্ঞান আমার সঙ্গে যাবে আর ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তি হলে, সনাতন ধাম লাভ হবে।

জড় জগৎ ও চিজ্জগৎ উভয়ের মালিক কৃষ্ণ, আমরা কোন জিনিসেরই মালিক নই। ঠিক যেমন সরকার রাষ্ট্রের সব কিছুর মালিক,

তা কয়েদখানার হোক্ বা তার বাইরের হোক্। বদ্ধ জীবন এই জড় জগতের কয়েদখানার জীবনের মতো। কয়েদী স্বেচ্ছায় তার কারাগৃহ পরিবর্তন করতে পারে না। একজন সাধারণ নাগরিক এক গৃহ থেকে অন্য গৃহে যেতে পারেন। কিন্তু কারাজীবনে তা কেউ পারে না। কয়েদীকে তার নির্দিষ্ট কারাকক্ষেই থাকতে হবে। জড় জগতের এইসব গ্রহলোকগুলি সবই কারাকক্ষের মতো। আমরা চন্দ্রলোকে যাওয়ার চেষ্টা করছি অথচ যান্ত্রিক উপায়ে কার্যতঃ তা সম্ভব নয়। আমরা আমেরিকান, ভারতীয়, চীনদেশবাসী বা রাশিয়ান যা-ই হই না, আমাদের বসবাসের জন্য এই গ্রহলোক দেওয়া হয়েছে। কোটি কোটি গ্রহলোক থাকলেও, আমাদের অনেক যন্ত্রপাতি থাকলেও, তবু ভগবানের আইন, প্রকৃতির পাশে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আমরা স্বেচ্ছায় এই জায়গা ত্যাগ করতে পারি না। কোন কারাগৃহে আবদ্ধ ব্যক্তি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া স্বেচ্ছায় অন্য কারাগৃহে যেতে পারে না। কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে, কারাগৃহের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা উচিত নয়। এইভাবে কেউ সুখী হতে পারে না। কোন কয়েদী যদি মনে করে আমি কারাগারের এই কক্ষে আছি আমার কক্ষ পরিবর্তনে কারারক্ষককে আমি অনুরোধ করি, আর তাহলে আমি সুখী হব"—সেটা ভুল ধারণা। কারাগারের প্রাচীরের ভিতরে যতক্ষণ কেউ থাকে, সে কখনও সুখী হতে পারে না। কারাকক্ষ পরিবর্তন দ্বারা পুঁজিবাদী থেকে সাম্যবাদী হয়ে আমরা সুখী হতে চেষ্টা করছি। এই মতবাদ বা ঐ মতবাদ—এসব থেকে মুক্তি লাভ—আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জড়বাদের এই 'মতবাদ'কে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা চাই, আমরা তখন সুখী হতে পারব। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের কর্মসূচী, কার্যক্রম।

আমরা পরম পুরুষের উপদেশ গ্রহণ করছি। তিনি বলেছেন, প্রিয় অর্জুন, তুমি ব্রহ্মলোক নামে সর্বোচ্চ গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারো।

আর অভীষ্ট লোকে বসবাসকারীর আয়ু অতি দীর্ঘ। আমরা এমনকি ব্রহ্মলোকের অর্ধদিবসের সময়েরই হিসাব করতে পারি না, তা আমাদের গাণিতিক হিসাবের উর্ধ্বে। কিন্তু ব্রহ্মলোকেও মৃত্যু আছে। এইজন্য কৃষ্ণ বলেছেন "উচ্চতর লোক বা এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যাওয়ার চেষ্টায় সময় নষ্ট কর না।"

আমেরিকায় জনগণকে আমি দেখেছি যারা বিরামহীন, ব্যস্ত। তারা গৃহ থেকে গৃহান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। ঐ রকম ব্যস্ত মানসিকতার কারণ হল আমরা আমাদের নিত্য আবাস, নিত্য ধামকে খুঁজে চলেছি। স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নিত্য, শাশ্বত জীবন লাভ করা যায় না। কৃষ্ণ সান্নিধ্যে জীবন শাশ্বত, জীবন অনন্ত। তাই কৃষ্ণ বলেছেন "আমি সবকিছুর মালিক। গোলোক বৃন্দাবন নামে আমার অতি চমৎকার ধাম আছে। এই ধাম লাভে ইচ্ছুক হলে তাঁকে অবশ্যই শুধু কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে আর কৃষ্ণের আবির্ভাব-তিরোভাব হৃদয়ঙ্গম করা চাই। কৃষ্ণের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ, জীব ও ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞান এবং এই সম্বন্ধ জ্ঞান অনুযায়ী জীবন যাপন করা চাই। কেবল বিজ্ঞানভিত্তিক এইসব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে হবে। কৃষ্ণভাবনামৃতে সবকিছুই বিজ্ঞানভিত্তিক। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আজেবাজে, খেয়ালখুশী, ভাবুকতা, অন্ধ গোঁড়ামি বা কল্পনাপ্রসূত কিছু নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হল পরমতত্ত্ব, বাস্তব সত্য। তত্ত্বতঃ কৃষ্ণকে অবশ্য জানা চাই।

ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় আমাদের এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। এমন দিন আসবে যখন আমাদের প্রকৃতির নিয়মাধীন হতে হবে এবং এই দেহ ত্যাগ করতে হবে। এমনকি তার শোভাযাত্রায় প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়মের অধীনে এক দেহ থেকে অন্য দেহ গ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি বলতে পারেন নি 'ওহে, আমি প্রেসিডেন্ট, আমি কেনেডি, আমি অন্য দেহ গ্রহণ করব না। তিনি

দেহান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। এইভাবে প্রকৃতি কাজ করে। প্রকৃতি কিভাবে কাজ করে, তা হৃদয়ঙ্গম করাই হল উন্নত মানব চেতনার উদ্দেশ্য। মানবচেতনা ছাড়াও কিন্তু—কুকুর, বিড়াল, কীট, বৃক্ষ, পাখী, পশু ও অন্যান্য সকল প্রজাতি জীবের চেতনা আছে। তবে সেই চেতনায় জীবন যাপনের জন্য আমরা নই। শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে অনেক অনেক জন্মের পর আমরা মানব দেহ লাভ করেছি। এখন আমরা যেন এই দেহের অপব্যবহার না করি। দয়া করে কৃষ্ণভাবনার বিকাশ করে এই মানব জীবনের উপযোগ করুন ও সুখী হউন।

সমাপ্ত